ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা অনুবাদ অনুষঙ্গ **শঙ্খ ঘোষ**

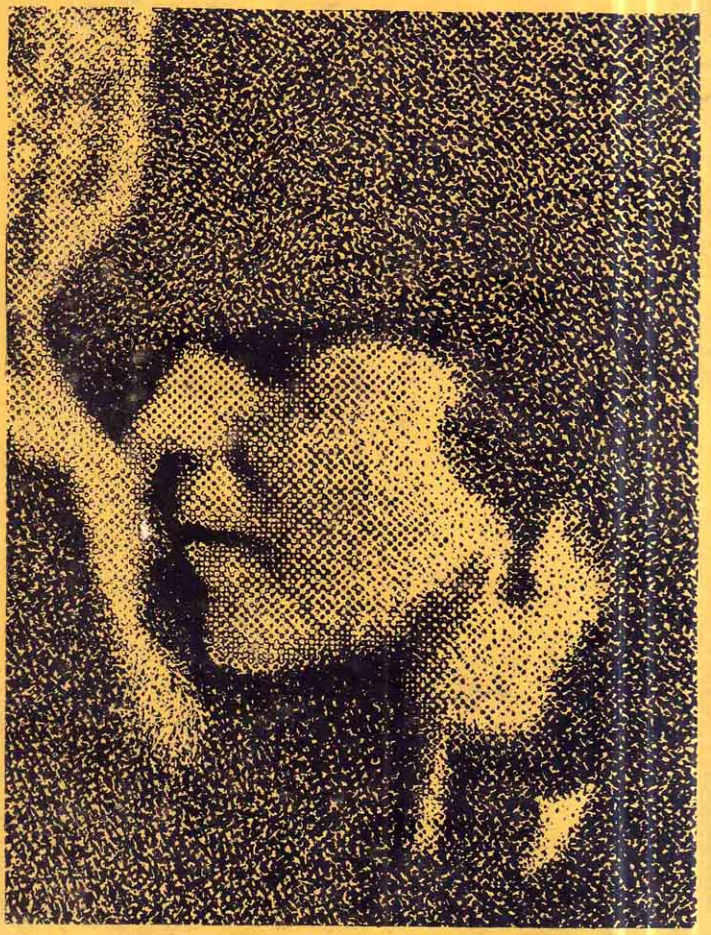

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিজয়াকে লিখেছিলেন একবার
'পূরবীর কবিতাগুলি যারা পড়বে, তারা
জানতেও পাবে না তোমার প্রতি কত তাদের
কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।' সত্যি,
অল্পই আমরা জানি তাঁর কথা
অথবা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা তাঁর
ছোটো বইখানির কথা। এখানে
রইল সে-বইটির প্রথম পূর্ণ অনুবাদ, বিজয়া
বিষয়ে নতুন কোনো-কোনো
তথ্য, আর শেষ পনেরো বছরের রবীন্দ্রনাথকে
জানবার মতো অনুষঙ্গী নানা বিবরণ।

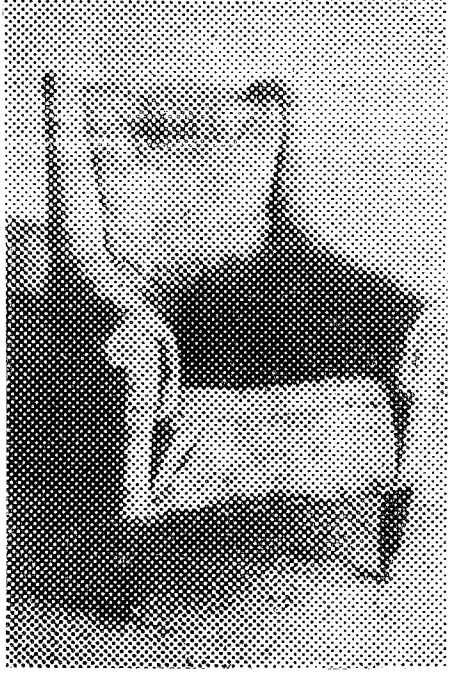

ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা ॥ অনুবাদ ॥ অনুষঙ্গ

শঙ্খ ঘোষ

pathagar.net

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০০৯

পরিবর্ধিত পরিমার্জিত সংস্করণ : পৌষ ১৩৮৩, ডিসেম্বর ১৯৭৬
প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮০, আগস্ট ১৯৭৩

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

বারো টাকা

প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ৩১/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯
মুদ্রক : শ্রীনিশিকান্ত হাটই, তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫২৬ বিধান সরণী, কলকাতা ৬

pathagar.net

পুলিনবিহারী সেন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

pathagar.net

লেখকের অন্যান্য বই :

দিনগুলি রাতগুলি
নিহিত পাতালছায়া
শ্রেষ্ঠ কবিতা
আদিম লতাগুল্মময়
মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়
বাবরের প্রার্থনা

সকালবেলার আলো

কালের মাত্রা এবং রবীন্দ্রনাটক
নিঃশব্দের তর্জনী
ছন্দের বারান্দা

pathagar.net

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা : বিজয়ার অলিন্দে ১৫-৩১

বিদেশিনী ১৭

সঙ্গনিঃসঙ্গ ২০

বিজয়ার অলিন্দ ২৫

সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ ৩৩-১০৫

খোলা পথের ধারে ৩৭

অলিন্দ ৫৩

নিঃসঙ্গ পুরুষ ৭৩

ভালোবাসা ৯১

অনুষঙ্গ ১০৭-১৮৭

ভিক্টোরিয়া প্রসঙ্গে ১০৯

সূত্রাবলি ১৩১

pathagar.net

চিত্রসূচি

	সম্মুখীন পৃষ্ঠা
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া	৩২
ভিক্টোরিয়া	৩৩
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া	৭২
মিরালরিও	৭৩
মিরালরিওর বাগানে রবীন্দ্রনাথ	৭৩
পাণ্ডুলিপি-চিত্র : 'হে বিদেশী ফুল'	৮৮
পাণ্ডুলিপি-চিত্র : 'ওগো বৈতরণী'	৮৯
ভিক্টোরিয়া	১০৬
ভিক্টোরিয়ার চিঠি	১০৭

pathagar.net

বিজয়ার অলিন্দে

pathagar.net

স্বীকৃতি

হঠাৎ একদিন ছোটো একখানি বই হাতে এল আয়ওয়ার লাইব্রেরিতে। স্পেনীয় ভাষায় লেখা। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে লিখেছেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো।

বই? এর আগে তাঁর লেখা দুটি-একটি স্মৃতিপ্রবন্ধ পড়েছি বটে ইংরেজিতে; কিন্তু পুরো একখানি বই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে? এর কি কোনো ইংরেজি অনুবাদ আছে? বাঙলা? দেশের কোনো কোনো রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞকে চিঠি লিখে জানলুম যে তাঁরা জানেন না বইটির খবর, আর ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো জানালেন যে বইটির সম্পূর্ণ কোনো ইংরেজি অনুবাদ হয়নি এখনো। বাঙলায় এই অনুবাদ করবার কল্পনা এল তখন। অনুবাদের অনুমতি দিলেন ভিক্টোরিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, আর ওরই পাশে লিখলেন 'I should like the Bengali translation to follow exactly the Spanish version'।

একথা লিখবার একটা কারণ ছিল অবশ্য। সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত শতবার্ষিক সংগ্রহে (*Rabindranath Tagore 1861-1961*) ভিক্টোরিয়ার যে লেখাটি আছে, সেটি এই বইয়েরই অংশ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনীর আগ্রহেই বইটি লিখেছিলেন ভিক্টোরিয়া, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, শতবার্ষিক সংগ্রহে মুদ্রিত হয় এর আংশিক অনুবাদ। আরো খানিকটা অংশ পাওয়া যায় ১৯৫৯সালের *Indian Literature* পত্রিকার এপ্রিল-সেপ্টেম্বর সংখ্যাটিতে। কিন্তু এসব অংশেও ইংরেজি আর স্পেনীয় পাঠ সর্বত্র একরকম নয়। ইংরেজি পাঠ বিষয়ে ভিক্টোরিয়ার মনে হয়েছে যে 'there are many things missing in it'। তাই আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ভিক্টোরিয়ার বইটির আখ্যাপত্রে কর্তৃপক্ষ যে লিখে রাখেন 'এ-বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যাবে শতবার্ষিক সংগ্রহে', দেখা যাচ্ছে সেটি ঠিক তথ্য নয়।

স্পেনীয় ভাষা আমার জানা নেই, শিখতে শুরু করেছিলুম মাত্র। ফলে আমাকে সাহায্য নিতে হয় রিচার্ড বার্কারের, যিনি ইংরেজি আর স্পেনীয় দুয়েরই অধ্যাপনা করতেন আয়ওয়ায়। বার্কারের কাছে আমাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন ইরান দেশের তরুণী কবি, তাহেরে সাফরজাদে। আজ মনে করতে ভালো লাগছে যে এই অনুবাদে অনেকখানি আগ্রহ ছিল তাঁর।

দেশে ফিরবার পর এটি ধারাবাহিক ছাপা হয়েছে 'অনুক্ত' পত্রিকায়। এই পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুনীলকুমার নন্দীর কাছে এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। বই হিসেবে যে এটি বেরোচ্ছে, সেও তাঁরই প্রযোজনায়।

আগে কোনো বইতে ছাপা হয়নি, এমন কয়েকটি ছবি এখানে ব্যবহার করা সম্ভব হলো বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে। একটি ছবিতে ভিক্টোরিয়ার মুখে যে কলঙ্কলাঞ্ছন দেখা যাবে, সে তাঁর স্বহস্তকৃত।

ভিক্টোরিয়া-রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র দেখতে দিয়েছেন রবীন্দ্রভবনের কর্তৃপক্ষ। রলাঁ বিষয়ে তাঁর একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে সাহায্য নিতে দিয়েছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য। উপকৃত হয়েছি টলস্টয় বিষয়ে শ্রীদিনেশচন্দ্র রায়ের একটি মন্তব্যে। ডার্মস্টাট থেকে কাউন্টেস কাইজারলিঙের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া বিষয়ে কথাবার্তার বিবরণ পাঠিয়েছিলেন শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কোনো কোনো বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে পরামর্শ পেয়েছি শ্রীঅমিয় দেবের কাছে। দু'একটি বই সংগ্রহ ক'রে দিয়েছেন শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। আর, সব সময়েই আমাদের অকৃপণ সাহায্য ক'রে যান রবীন্দ্রভাণ্ডারী শ্রীপুলিনবিহারী সেন।

সান ইসিদ্রোর আরোগ্য-আশ্রয় 'মিরালরিও' থেকে অনেক ঘাট পেরিয়ে একদিন 'উত্তরায়ণ' পর্যন্ত এসে পৌঁছল একটি চেয়ার,

pathagar.net

ভিক্টোরিয়ার প্রীতিচিহ্ন। আর মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস আগে (২৬ মার্চ ১৯৪১) রবীন্দ্রনাথ সেটিকে নিয়ে লিখলেন এই কবিতা :

রৌদ্রতাপ ঝাঁ ঝাঁ করে
জনহীন বেলা দুপহরে।
শূন্য চৌকির পানে চাহি,
সেথায় সান্ত্বনালেশ নাহি।
বুক ভরা তার
হতাশের ভাষা যেন করে হাহাকার।
শূন্যতার বাণী ওঠে করুণায় ভরা,
মর্ম তার নাহি যায় ধরা।
কুকুর মনিবহারা যেমন করুণ চোখে চায়,
অবুঝ মনের ব্যথা করে হায়-হায় ;
কী হল যে, কেন হল, কিছু নাহি বোঝে—
দিনরাত ব্যর্থ চোখে চারিদিকে খোঁজে।
চৌকির ভাষা যেন আরো বেশি করুণ কাতর,
শূন্যতার মূক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয়হীন ঘর।

এ-বইয়ের আখ্যাপত্রে রইল সেই 'শূন্য চৌকি'টির চিত্রাভাস।

২২ শ্রাবণ ১৩৮০

শঙ্খ ঘোষ

pathagar.net

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

অল্প-কিছু বদল হলো নতুন এই সংস্করণে। নতুন কয়েকটি তথ্যের যোজনা সম্ভব হলো 'অনুষঙ্গ' অংশে।

দক্ষিণ আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ যেতে পেরেছিলেন পেরুর আমন্ত্রণে, এই আমরা জানি। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে পুরোনো সব বিবরণ (দ্র পৃ ১৪১-৪৪) থেকে দু'একটা প্রশ্নও জেগে ওঠে মনে। আর্জেন্টিনাতেই রবীন্দ্রনাথকে থেকে যেতে হলো কেন? শুধু কি অসুস্থতারই জন্য? শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন যে এই বাধা ছাড়াও 'কবিকে বুঝানো হইল যে শতবার্ষিকী উৎসব আসলে একটি যুদ্ধের দিনের স্মরণ, ইহার মধ্যে কোনো আদর্শবাদ নাই।' এই বোঝানোর মধ্যে 'ইংরেজের রাজনীতিক কোনো চাল ছিল কি না', এ নিয়েও সন্দেহ তুলেছিলেন প্রভাতকুমার। কাইজারলিঙের স্মৃতিচর্চা থেকে আরো একটু ধাক্কা লাগে এই খবর শুনে যে 'একবার ভারতবর্ষে পেরু সরকারের প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে এক ঠক' না কি আমন্ত্রণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। নিষ্কপর্দক অবস্থায় বুয়েনস আইরেসে পৌঁছে দেখা গেল, 'কেউ তাঁকে নিতে আসে নি। বিমূঢ়, বাক্যহত, অসহায় কবি সবকিছুতেই তখন বিরক্ত।'

এসব ব্যাপারে, এখন, আরো একটু বিস্তারিত জানা যাচ্ছে রোম্যাঁ রলাঁর ভারতবিষয়ক জার্নালটি থেকে। এল্‌ম্‌হার্স্টের কাছে রলাঁ জেনেছেন যে বুয়েনস আইরেসে পৌঁছে তাঁরা দেখেন, 'আর্জেন্টিনাস্থ পেরুর রাষ্ট্রদূত রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানোর কিছুই জানেন না, এবং পেরুর সরকারও তাঁকে কোনো নির্দেশ পাঠায় নি।' এ নিয়ে তৈরি হলো বেশ অপ্রীতিকর অবস্থা, যুক্তি সবটা জানতেও দেওয়া হয় নি রবীন্দ্রনাথকে।

pathagar.net

নতুন এই সংস্করণে দেওয়া হলো (পৃ ১৪৫-৪৭) রলাঁর সেই বিবরণ। এটা যে সম্ভব হলো, শ্রীঅবন্তীকুমার সান্যাল অনূদিত 'ভারতবর্ষ: দিনপঞ্জী ১৯১৫-১৯৪৩' বইটির কাছে সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

পুরোনো সংস্করণেই একথা বলা হয়েছিল যে স্পেনীয় ভাষায় মূল বইটি ছাড়াও ওকাম্পোর এই লেখার আরো দুটি স্বতন্ত্র আংশিক পাঠ আছে। সাহিত্য অকাদেমীর শতবার্ষিক সংগ্রহ আর 'ইণ্ডিয়ান লিটারেচার' পত্রিকার একটি সংখ্যায় (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯৫৯) পাওয়া যাবে সে-দুটি। কিন্তু এখন জানতে পারছি যে এর আরো একটি পাঠের কথা বলা সম্ভব।

শতবার্ষিক উৎসবের সময়ে ওকাম্পোর একটি ভাষণ টেপ করা হয়েছিল; অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো সেই টেপটি পরে পাঠিয়ে দেন বিশ্বভারতীতে। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত সেই ষোলো মিনিটের টেপ যে আমাদের নতুন কোনো তথ্য জানাচ্ছে, তা অবশ্য নয়। এ-বইয়েরই নির্বাচিত অংশমাত্র সেখানে পড়ে শোনাচ্ছেন ওকাম্পো, ইংরেজিতে, দু'চারটি শব্দ বা 'একটি বাক্যের অদলবদল ক'রে। নির্বাচিত, তাই এটা হয়ে উঠছে এক ভিন্ন পাঠ। ভিক্টোরিয়ার ভরাট, আবিষ্ট, কিছু-বা মন্থর গলায় শুনতে ভালো লাগবে এই স্মৃতি, বিশেষত শতবার্ষিক সংগ্রহের ধরনে যখন তিনি শেষ করেন এই কথা ব'লে: 'সান ইনিদ্রোতে থাকবার সময়ে আমাকে বাঙলার কয়েকটি শব্দ শিখিয়েছিলেন কবি। আমি মনে রেখেছি শুধু একটি, আর ভারতবর্ষকে কেবল সেইটেই বলে যাব আমি: ভালোবাসা।'

আমরা জানি, ভিক্টোরিয়ার সমস্ত বইটি জুড়ে আছে সেই ভালোবাসারই উচ্চারণ।

১ পৌষ ১৩৮৩

শঙ্খ ঘোষ

pathagar.net

বিদেশিনী

কবিতায় বা গানে ফিরে-ফিরেই একজন বিদেশিনীর কথা বলেন রবীন্দ্রনাথ, বলেন এক অপরিচিতার নাম, যে তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে দূরতম কোনো সুন্দরের দিকে। 'সোনার তরী' বা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র নৌকোটিতেই যে এর প্রথম দেখা মিলল তা নয়, চেনা-অচেনায় জড়ানো রহস্য নিয়ে অনেককাল ধ'রেই এর উষ্ণতা অনুভব করছিলেন কবি। হয়তো-বা নাম ছিল ভিন্ন, হয়তো-বা প্রকাশের ভঙ্গি ছিল ভিন্ন। হয়তো কখনো পৃথিবীর প্রতিবেশিনীর মেয়ে হয়ে দেখা দেয় সে,[১] অথবা কখনো জগতের নদীগিরি সকলের শেষে সে এক বিরহিণী প্রিয়া,[২] আবার কখনো সে এই বিপুল বিশ্বলোকের এক প্রতিধ্বনি মাত্র,[৩] অনতিগোচর অনতিশ্রুত কোনো প্রতিধ্বনি। আমরা জানি যে এই প্রতিধ্বনিকে একেবারে এড়িয়ে গিয়ে তাঁর রচনাপাঠ শেষ পর্যন্ত সম্ভব নয়।[৪]

কিন্তু কে এই বিদেশিনী? স্পষ্ট কোনো নাম কি আছে তাঁর? স্থির কোনো পরিচয়? অনেক সময়ে আমরা ঘুরেছি এই কৌতূহল নিয়ে, জানতে চেয়েছি তার ইতিবৃত্ত, অনেক সময়ে আমরা চিহ্নিত ক'রে বলতে চেয়েছি: এই, এই সে। হয়তো কোনো নারীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি গেছে কখনো,[৫] কখনো ভেবেছি পশ্চিমযাত্রিণী এক কল্পনা যেন কবির মনকে টেনে নিচ্ছে ইওরোপের দিকে,[৬] এ যেন কোনো বিদেশবাসিনী ইওরোপলক্ষ্মীরই ছায়াচ্ছন্ন আবির্ভাব।

এতটা দুর্ভাবনার কারণ ছিল না অবশ্য। 'জীবনস্মৃতি'র নানা টুকরোয় কবি নিজেই উল্লেখ করেন তাঁর এই অনুভবের বিবরণ, বেশ খুলেই বলেন কী তিনি ভাবছিলেন ওই শব্দটির ইশারায়। 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে' ছোটোবেলায় শোনা এই গানটি থেকে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল আমাদের চেনা লাইন 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।' এই সুরগুঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে কবি দেখতে পেয়েছিলেন আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি-কোন্-বিদেশিনীর আনাগোনা। 'কোন্ রহস্যসিন্ধুর পরপারের ঘাটের উপরে তাহার

www.pathagar.net

বাড়ি, তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবীরাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই, হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো শুনিয়াছি' এই ব'লে কবি তার বর্ণনা করেন 'জীবনস্মৃতি' বইতে।[৭]

এই তো তবে তার পরিচয়। এর চেয়েও বেশি ভাবনার কি দরকার ছিল কোনো? এ তো আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা যে কখনো কখনো চেনা এই পৃথিবীর উপর এক অচেনা মায়া এসে লাগে, সুন্দরের সামনে এসে হঠাৎ যেন দেখতে পাই পৃথিবীর আরো একটা গোপন অবয়ব, যা আমাদের আকর্ষণ করে প্রবল-টানে, যার কোনো সম্পূর্ণ দিশা পাই না আমরা। মাটিকে মাটি, জলকে জল ব'লেই দেখতে পাই না আর, হঠাৎ যেন বস্তুর অন্তঃসার টের পেয়ে যাই তখন। নিজেরও অগোচরে আমাদের নিভৃত এক মন আছে—বেদনাময় সুন্দরকে স্পর্শ করবার এইসব মুহূর্তে চকিতে জেগে ওঠে সেই মন। এই জেগে-ওঠার কী নাম দেব? এই মনেরই সংযোগ কি সবকিছুকে মায়াময় ক'রে তোলে না, এনে দেয় না অপরিচয়ের ছায়া? এই জেগে-ওঠাই প্রতিদিনের আড়ালে ব'সে-থাকা সেই বিদেশিনী, কর্মকৃতিময় সংসারের বাইরে গেলে তবে তার সঙ্গে আমাদের দেখাশোনা হয়।

এটা লক্ষ করবার বিষয় যে গান আর সুরের কথা বলার জন্যই রবীন্দ্রনাথকে ভাবতে হয়েছিল এই শব্দটি। কথায় সুরের টান এসে পৌঁছলে কথা যেন ছেড়ে যায় তার বুদ্ধিময় অর্থের বৃত্ত। ছেড়ে কোথায় যায়? নিবিড় কোনো গান শুনতে শুনতে অনেক সময়ে আমরা টেরও পাই না মন কখন স'রে গেছে তার ভাষা থেকে, অনেক দূরে। দূরে কোথায়? কার সঙ্গে তখন যুক্ত হতে চাই আমরা? আমাদের ভিতরকার মনের সঙ্গে। বস্তুত সে-মন লিপ্ত হয়ে আছে আমাদের প্রবহমান স্মৃতিতে, আমাদের আশায়—একই সঙ্গে আমাদের অতীতে আর ভবিষ্যতে। অতীত-ভবিষ্যৎ এসে এক মুহূর্তের জন্য মিলে যায় একবার, আর এইভাবে চকিতে আমরা ছুঁয়ে নিই সময়ের মধ্যে এক নিঃসময়কে। এ অভিজ্ঞতা আমাদের প্রতিদিনের চেনা নয় ব'লেই তাকে

আমরা বুঝে নিতে চাই অপরিচয়ের কোনো নামে, রহস্যময় ব'লেই সে পেতে চায় যেন নারীর চরিত্র, দূরবর্তিনী ব'লেই তার নাম দিতে চাই 'বিদেশিনী'।

তাই, মারিও প্রাজ যেভাবে রোম্যান্টিক বেদনার ভিতরে প্রচ্ছন্ন এক exotic প্রবণতার কথা বলেন,[৮] যে-প্রবণতায় ইওরোপীয় রোম্যান্টিকদের পক্ষে সম্ভব ছিল কোনো প্রাচ্য ভূখণ্ডের স্বপ্ন দেখা, রবীন্দ্রনাথের বিদেশিনী তেমন কোনো exotic পশ্চিমি আকর্ষণ মাত্র নয়। স্মৃতিতে-আশায় মেলানো এই আমাদের অন্তর্গত উন্মোচন: এই হলো কবির সেই অপরিচিতা। 'প্রভাতসংগীতে'র 'প্রতিধ্বনি' কবিতাটিতে তিনি প্রায় এভাবেই বলেছিলেন। সেখানে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন এক আলো-ছায়ার সিংহাসন, যে-আসনে 'আপনে আপনি মিশি' ব'সে আছে কোনো ছায়ামূর্তি, 'স্মৃতি ও আশায় বিজড়িত' যে আসন। আর 'সংগীত সৌরভ শোভা / জগতে যা কিছু আছে' সবই এসে সেইখানে প্রতিধ্বনিময় হয়ে ওঠে। দেশ-কালকে এইভাবে দেশ-কালের অতীত ক'রে দেয় যে, তারই নাম বিদেশিনী।

কিন্তু দেশকালের মধ্যেই যে জড়িত হয়ে আছি আমরা! কবি কখনো কখনো তার থেকে আমাদের বার ক'রে নেন বটে; কিন্তু সব সময়ে তিনি নিজেও কি পান এই উত্তরণের মুহূর্ত? তাঁরও মন আবৃত হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে, জাগতিক হলাহলে কিছু-বা অসংবৃত হয়ে পড়েন তিনি, তাই তিনিও চান এমন একটা অবকাশ যেখানে দাঁড়ালে দেশকালের মধ্যেই দেশকালের অতীতকে দেখতে পাওয়া যায়। কোনো সুর হয়তো সেই অবকাশ এনে দেয়, কোনো শিল্প হয়তো সেই অবকাশ, তেমনি আবার কখনো-কখনো কোনো নারীই হয়ে ওঠে কবির সেই অবকাশমূর্তি, তারই মধ্য দিয়ে ধরা যায় সুর বা শিল্প। যে বিদেশিনীর কথা ভাবেন কবি, সে কোনো মানবী নয়, সে কোনো প্রাচী বা প্রতীচীর দিকে চকিত ইঙ্গিত নয়, আবার সেইসঙ্গে এও ঠিক যে, কখনো হয়তো কোনো-একটি বিশেষ মানবীমূর্তিই তাঁকে পৌঁছে দেয় সেই বিদেশিনী আভার দিকে, সেই সুন্দরের অবকাশে। তাই, হৃদয়ে যার আভাস

pathagar.net

পাওয়া গেছে, আকাশে কান পেতে যার স্রোতোময় কণ্ঠস্বর শোনা গেছে, তাকে কখনো-বা তিনি সাজিয়ে দেখতে চান কোনো নারীরই মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নারীর মধ্যে। তাই, যে-গান তিনি লিখেছিলেন দূর-যৌবনের দিনে,[৯] প্রৌঢ় বয়সে সেই গান তিনি তুলে দিতে পারেন এক মানবীরই অভিমুখে : বিদেশবাসিনী কোনো ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর হাতে তিনি সহজেই পৌঁছে দিতে পারেন এই কথা : 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী!' 'সত্যি কি আমাকে চিনেছিলেন?' এই প্রশ্ন তুলেছিলেন ভিক্টোরিয়া, অনেক বছর পেরিয়ে।[১০] কিন্তু এই প্রশ্ন করবার আগে জেনে নেওয়া চাই : একই সঙ্গে সত্যি এই কথা যে ওই গানে তিনি আছেন এবং তিনি নেই। 'পরিচয় আর অপরিচয় আমার মনের মধ্যে এক হয়ে মিলেছিল' জেনে নেওয়া চাই এই স্বীকারোক্তি, 'জানি না যখন জানির আঁচলে গাঁটছড়া বেঁধে দেখা দেয় তখন মন বলে, ধন্য হলেম'।[১১] তাই সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে যে তুলনাহীনাকে পথে যেতে দেখেন কবি, মনে রাখা চাই যে একই সঙ্গে তিনি চেনা এবং চেনা নন, নারী এবং নারী নন।[১২] এইটুকু শুধু ঠিক যে কবিজীবনে এমন একটা মুহূর্ত এসেছিল, যখন তাঁর আরো একবার এই গণ্ডিবাঁধা দেশকালকে অতিক্রম ক'রে যাবার প্রয়োজন ঘটেছিল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভিক্টোরিয়ার সান্নিধ্য তাঁকে আরো একবার পৌঁছে দিচ্ছিল তাঁর 'বিদেশিনী' ভাবনার দিকে। মাত্র সেইটুকু অর্থে, এই ভিক্টোরিয়াও তাঁর বিদেশিনী, তাঁর সুন্দরের সহচরী।

সঙ্গনিঃসঙ্গ

'জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।'[১৩] দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফিরবার পথে এই হলো কবির এক দিনলিপির সূচনা। এক হিসেবে, এ তো শিল্পীমাত্রেরই ভাগ্য, ভিতরে

pathagar.net

ভিতরে এই নির্জন নিঃসঙ্গতা। হয়তো আমরা সব সময়ে মনে রাখি না যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সেই একলা-সাগরে ভাসমান। তাঁর ব্যাপৃত মূর্তি, কাজেকর্মে তাঁর চঞ্চল পরিচয় এতটাই আমাদের চিত্ত অধিকার ক'রে থাকে যে সহসা আমরা দেখতে পাই না ভিড় থেকে তাঁর পালিয়ে যাবার না-নৌকোটিকে,* আমরা জানতে পাই না যে এই নির্জন ভেলাটি সব সময়েই চলছে তাঁর রচনাজীবনের গোপনে গোপনে। 'গীতিমাল্যে'র একটি গানে[১৪] যে অনেকদিন আগেই তিনি লিখেছিলেন 'ভেলার মতো বুকে টানি / কলমখানি / মন যে ভেসে চলে' তা আমরা লক্ষই করিনি তত। এই কলমের ভেলা নিয়ে নিঃসঙ্গ ভেসে যাওয়া কবি : এই হলো তাঁর এক পরিচয়।

কিন্তু সাধ্য কী যে সে-ভাবেই ভেসে যাবেন তিনি। তাঁকে আবার দাঁড়াতেও হয় সকলের মাঝখানে; প্রতিদিনের বস্তুজীবনের আয়োজনে। কবির সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিতে হয় সন্তের দায়িত্ব, হয়ে উঠতে হয় মহান্ সাত্রী। তখন দেখা দেয় এই দুই অস্তিত্বের মধ্যে লড়াই, কবি ও গুরুর দ্বন্দ্ব। 'আমার অবস্থাটা ব্যস্ত, আমার স্বভাবটা কুঁড়ে, কেবলই দ্বন্দ্ব বাধে, কিন্তু অবস্থারই জিত হয়' এই ব'লে কবি আক্ষেপ করেন হেমন্তবালা দেবীর কাছে, ১৯৩২ সালে।[১৫] কিন্তু বস্তুত এ-দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল অনেক আগেই, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর থেকেই, ওই উচ্চারণের ঠিক কুড়ি বছর আগে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে বারংবার জানিয়েছেন তিনি 'গুরুর পদ আমার নয়, নয়, নয়' অথবা 'জগতে যদি আমার কোনো সত্যকার স্থান থাকে তবে সে কবি হিসাবে, গুরু হিসাবে একেবারেই না'।[১৬]

এই উচ্চারণের সময়ে তাঁর মনে ছিল হয়তো অল্পকটি দীক্ষার্থী তরুণের মুখ, তিনি ভাগ্যের এই পরিহাস তখনো জানতেন না যে আর কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁকে নিতে হবে প্রায় জগৎগুরুর ভূমিকা। ১৯১২-১৩, ১৯১৬-১৭, ১৯২০-২১,

* তু 'ওগো না-নৌকোর নাবিক, আমাকে জোরের সঙ্গে তোমার নৌকোয় টেনে নিয়ে, একেবারে মাঝদরিয়ায় পাড়ি দাও—অকাজের ঘাটে আমার তলব আছে।' পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৪।

pathagar.net

১৯২৪-২৫ : পরম্পরায় এসব বিদেশ-যাত্রা ক্রমেই যেন কবিকে পরিয়ে দিচ্ছে ধর্মযাজকের পোশাক, 'সাধনা' (১৯১৩) বা 'পার্সোনালিটি'র (১৯১৭) বক্তৃতাবলি নিয়ে প্রতীচ্যে তিনি হয়ে উঠছেন যেন প্রাচীন এক ভারতমূর্তি, তাঁর কবিতারচনাও এত অবিশ্বাস্যভাবে ক্ষীণ হয়ে এল 'বলাকা'র (১৯১৬) পরবর্তী সাত আট বছর জুড়ে।* যতই বেশি ক'রে বাড়ছিল এই দায়, ততই যে তিনি ছিঁড়ে যাচ্ছিলেন ভিতরে ভিতরে, সেকথা বোঝা যায় তাঁর দিনপঞ্জি বা চিঠিপত্র থেকে।[১৭] ছিঁড়ে যাচ্ছিলেন, কেননা এই ভারততত্ত্ব প্রচার তেমন কোনো গরিমা পায়নি যতটা হয়তো প্রত্যাশা ছিল তাঁর, যতটা হয়তো ধারণা ছিল আমাদের। বিদেশে যখনই গেছেন তখনই তিনি উজাড়-করা সম্মান পেয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সম্মাননা কি নবীন কোনো মনীষাকে ততটাই উদ্‌বেজিত করছিল সেদেশে? ভবিষ্যতের তরুণদলকে জাগ্রত করছিল তেমনভাবে? আমাদের অনেক সময়ে জানতেও দেওয়া হয়নি প্রাচী-প্রতীচীর বিরূপ প্রতিক্রিয়াগুলি, জানলে ভালোই হতো হয়তো। কিন্তু আমরা না জানলেও রবীন্দ্রনাথ জানতেন সেই নিষ্ফলতার আঘাত, যে-আঘাত যে-প্রত্যাখ্যান কখনো কখনো তাঁর চোখে জল এনে দিয়েছে। তাই এসব ভ্রমণ একদিকে যেমন তাঁকে কথার পর কথায় আচ্ছন্ন দেখায়, অন্যদিকে তেমনি প্রচ্ছন্ন থাকে এর বিরুদ্ধে ধিক্‌কার, যেমন হঠাৎ হঠাৎ লিখে ফেলেন অ্যাণ্ডরুজকে, 'কবি হয়ে তো জন্মেছিলাম! কোনো ধ্যানের অবকাশ নেই যেসব ব্যস্ত মানুষের তারা যে আমাকে আমার চলার পথে এমনিভাবে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে, এটা সহ্য করা ভারি শক্ত!'[১৮] তখন, তিনি তাঁর চারপাশে দেখতে পান কেবল 'ভিড়ের মরুভূমি' কিংবা 'অগণনের ক্লান্তি'![১৯]

তবু, এসব কথার বছর তিনেকের মধ্যে আবারও তিনি মেনে নেন নূতন আহ্বান, এবার চীনদেশের নিমন্ত্রণ। এ নিমন্ত্রণ যে চিরযৌবন কবিকেই নয়, এ যে পাকা কথার প্রবীণকেই ডাক পাঠানো, সেকথা জানতেন তিনি।[২০]

* এই সময়ের মধ্যে ছাপা হয়েছে তাঁর দুটিমাত্র কবিতার বই 'পলাতকা' (১৯১৮) আর 'শিশু-ভোলানাথ' (১৯২২)। একটি কাহিনী-আশ্রিত, অন্যটি শিশু-নির্ভর।

pathagar.net

তবু, পুরোনো ভ্রমণগুলির মতোই তিনি মেনে নেন এই ভ্রমণ, প্রাচ্যের পুনরুত্থানস্বপ্ন জাগিয়ে তুলবার সাধনা করেন কয়েকটা দিন। কিন্তু এইবার, ১৯২৪ সালের এই প্রবীণ বয়সে, তাঁকে সইতে হলো বেশ বড়োরকমের প্রত্যাখ্যান, চীনা ভাবুক এবং যুবকদের সকলেই খুব সহজভাবে মানতে পারলেন না তাঁকে, খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠল অনেকের প্রতিবাদের আচরণ। অনেকেই মনে করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ এখানে বিস্তার করতে এসেছেন এক হিন্দু ছলা, প্রগতির পরিপন্থী এক কর্মহীনতার বাণী, ঐতিহ্যবিলাস, কেউ কেউ এর মধ্যে সংগোপন সাম্রাজ্যিক চক্রান্তও পেলেন খুঁজে। তরুণ মাও-সে-তুঙের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা সাবধান ক'রে দিলেন অল্পবয়সীদের, সরাসরি জানিয়ে দিলেন যে নবকীর্তিত 'প্রাচ্য সভ্যতা'র কিছুই তাঁরা চান না। এমনই প্রকাশ্য হয়ে দাঁড়াল কোনো কোনো বিদ্রোহ বা অসহযোগ যে খানিকটা থমকে গেলেন কবি, এমন-কী বাতিল ক'রে দিতে হলো তাঁর পূর্বঘোষিত কয়েকদিনের সভা। সাংহাই বা পিকিঙের দুঃস্থ অভিজ্ঞতার পর হ্যাংকাও পৌঁছেও তাঁকে শুনতে হলো রূঢ় এই চিৎকার, 'ফিরে যাও, পরাভূত দেশের ক্রীতদাস, ফিরে যাও।' ফিরেই এলেন তিনি অল্প পরে, চীনদেশের মানুষের কাছে এই রইল তাঁর শেষ বিদায়বাণী: 'নিজের দেশ থেকে এই দূরের দেশ পর্যন্ত দুর্ভাগ্য আমাকে কেবলই তাড়া করে ফিরেছে!' কোথাও একটা ভ্রান্তিযোগ ঘটেছিল নিশ্চয়, এল্‌ম্‌হার্স্ট আক্ষেপ ক'রে জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠিকমতো নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগই পাননি তেমন, কিন্তু এও ঠিক যে এইসব হতশ্রী ঘটনাপরম্পরা তাঁর মনকে পৌঁছে দিল একেবারে নিষ্ফলতার কূলে, ভিতরে ভিতরে অসীম ক্লান্তি নিয়ে তাঁকে ফিরতে হলো দেশে।[২১] 'নিছক সম্মান পাবার সৌভাগ্য আমার হয়নি' —দেশে ফিরেই তাঁকে বলতে হলো এই কথা; ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের অভিনন্দন-সভায় যেন নিজেকেই নিজে মনে করিয়ে দিলেন যে প্রচারক নন তিনি, তিনি কবি।[২২]

হয়তো সেইজন্যেই দক্ষিণ আমেরিকার আমন্ত্রণ তাঁর খোলা হাওয়ার মতো লেগেছিল, কেননা 'এবার হালকা হয়ে চলেছি, আমাকে প্রবীণ সাজতে হবে

pathagar.net

না।' তিনি জানেন যে 'বক্তৃতা যত করি তার কুয়াশার মধ্যে আপনি ঢাকা পড়ে যাই। সে তো আমার কবির পরিচয় নয়।' এবার যেন সেই কবির পরিচয় নিয়ে দায়বিহীন চলেছেন তিনি উৎসবের সাজে, তাই যাত্রাপথের পঞ্জিতে বারবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন তাঁর সন্তের ভূমিকা, কবি আর গুরুর দ্বন্দ্ব তাই এমন অগাধ শোচনার সঙ্গে দেখা দিল 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'খানি জুড়ে। 'আমার জীবনের প্রধান সংকট এই যে যদিচ স্বভাবত আমি আরণ্যক তবু আমার কর্মস্থানের কুগ্রহ আমাকে সাধারণ্যক করে দাঁড় করিয়েছেন' অথবা 'কাব্যসরস্বতীর সেবক হয়ে গোলমালে আজ গণপতির দরবারে তকমা পরে বসেছি' 'ইস্কুলপালানো লক্ষ্মীছাড়াটা গাম্ভীর্যের নিবিড় ছায়ায় কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা করছিল' এসব কথায় বার বার তিনি বুঝিয়ে দেন যে কেবলই 'দুই পক্ষের বিরোধ চলছে' তাঁর 'অন্তরের খাসকামরায়।'[২৩]

তাই, এই যাত্রার মুহূর্তে তাঁর প্রয়োজন হলো নবীন এক অবকাশের, আরো-একবার তিনি ভর করতে চাইলেন তাঁর নিভৃত মনে, খুঁজে বেড়ালেন মুক্তি। 'লোকের ডাকাডাকি শুনো না' এই কথা তিনি শোনালেন নিজেকে। কার আহ্বান তবে শুনবেন? 'আমারে যে ডাক দেবে এ-জীবনে তারে বারংবার / ফিরেছি ডাকিয়া' এই ব'লে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন তিনি? চীন যাবার অল্প কদিন আগেই 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতায় কবির মনে হচ্ছিল যে কঙ্কণ-ঝংকারে যেন খুলে যাচ্ছে এক রুদ্ধ দুয়ার, সে-কবিতায় যেন ছিল মিলনেরই প্রসাদ। কিন্তু ফিরে আসার পরে তিনি জানেন যে ঘ'টে গেছে পুনর্বিচ্ছেদ, তাই আবার তিনি শুনতে চান নতুন কোনো 'আহ্বান'। এবার তিনি বুঝে নেন যে এক 'আত্মবিস্মৃতির তমসা' ঘনিয়ে উঠেছিল কোথাও, 'সহস্রের বন্যাস্রোত' বা 'লুপ্তির কুয়াশা' ঘিরে ধরেছিল তাঁকে, খ্যাতিবিড়ম্বনা থেকে সরে এসে তাই তিনি 'অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে' আজ আলো জ্বেলে নিতে চান।[২৪] কিন্তু কে জ্বালাবে আলো? কার কাছে যাবেন তিনি আজ? 'গোধূলি রাগের রাঙা আলোতে তোমার সেই দূরের বাঁশরীর সন্ধানে নির্ভয়ে চলে যাও' এই হলো তাঁর উত্তর। 'সাগরপারে যে-অপরিচিতা আছে তার

অবগুণ্ঠন মোচন করবার জন্যে কি কোনো উৎকণ্ঠা নেই?' এই হলো তাঁর জিজ্ঞাসা।[২৫]

সাগরপার! আবার সেই রহস্যসিন্ধু! রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপর যার বাড়ি, তার অবগুণ্ঠন মোচনের উৎকণ্ঠা নিয়ে তিনি তবে এসে পৌঁছলেন বুয়েনস আইরেসে, 'পূরবী'র পথিক কবিতাগুলি লিখতে লিখতে, ১৯২৪ সালের ৬ নভেম্বর। এই যেন তাঁর ফিরে আসা সন্ত থেকে কবির জীবনে আবার, 'সাধনা' থেকে 'পূরবী'তে। কলরোলময়, গ্লানি ও লাঞ্ছনা-ময় এই পৃথিবীর উপর আরো একবার তিনি তখন দেখে নিতে চাইছেন এক মায়াময়ী বিদেশিনীকে, যাকে শারদপ্রাতে ক্ষণে ক্ষণে দেখা যায়, হৃদয়ের মাঝখানে আছে যার আভাস, আকাশে যার কণ্ঠস্বর ভাসে। আর ঠিক তখনই, তাঁর বিক্ষত মনের সামনে এসে দাঁড়াল এক নবীনা। এই নারীকে তিনি পরিয়ে দিলেন তাঁর হৃদয়জাত সেই বিদেশিনীর সাজ, অনায়াসে তার হাতে তুলে দিলেন অনেক দিনের পুরোনো সেই গানখানি: 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।'

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে দেখা হলো রবীন্দ্রনাথের। এই বিদেশিনীর নাম দিলেন তিনি: 'বিজয়া'।

বিজয়ার অলিন্দ

আর, আর্জেন্টিনার ওই নারী কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন রবীন্দ্রনাথের জন্য? মনে মনে ভিক্টোরিয়া বানিয়ে তুলছিলেন কোন্-সেই অলিন্দ যেখানে এসে ভর ক'রে দাঁড়াবেন প্রাচ্যবৈভবের এই কবি?

বাইরের তথ্য থেকে অল্পই আমরা জানতে পাই। বুয়েনস আইরেসের অভিজাত এক পরিবারের এই কন্যা, বেড়ে উঠছিলেন ইংরেজ আর ফরাসি গভর্নেসের দেখাশোনায়, ক্রমে হয়ে উঠলেন ও-দেশের শিল্প-সাহিত্যের সংসারে

pathagar.net

গরিমাময় এক ব্যক্তিত্ব। আজ, রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে দিনযাপনের অনেককাল পরে, দেশে তাঁর পরিচয় আরো ব্যাপক নিশ্চয়। কয়েকটি বইয়ের লেখক, কয়েকটি পুরস্কারের প্রাপক, কয়েকটি সংস্থার পরিচালক এবং প্রভাবময় একটি সাময়িকীর সম্পাদক হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা আজ দীর্ঘকাল জুড়ে আর্জেন্টিনার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁকে বরেণ্য ক'রে রেখেছে। এদেশে আমরা তাঁকে জানি কেবল এইজন্যে যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিষ্কম্প তাঁর অনুরাগ, আর তাঁর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের এক ভিন্ন মুখ কখনো কখনো আমরা দেখতে পাই হঠাৎ; রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে তাঁর রচনাবলি আমাদের আগ্রহের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তাঁর আগ্রহ আমাদের আনন্দের বিষয়। আর, হয়তো এসব ভাবনা মনে ছিল ব'লেই এই অল্প দিন আগে বিশ্বভারতী তাঁকে বরণ ক'রে নিলেন কৃতজ্ঞ এক উপাধিতে, বললেন 'দেশিকোত্তম'।[২৬]

কিন্তু এ সবই হলো বাইরের পরিচয়, উত্তরকালীন ইতিহাস। আমাদের এখন কিছুক্ষণের জন্য ফিরে যেতে হবে পুরোনো দিনের ভাবনায়, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর প্রথম যৌবনের দিনগুলিতে। একবার আমাদের জেনে নিতে হবে সেদিনকার আর্জেন্টিনার মনোভূমি।

লাতিন আমেরিকার আর-সব দেশের মতো আর্জেন্টিনারও সেদিন ছিল আত্মপরিচয়ের সমস্যা। বুয়েনস আইরেসে রবীন্দ্রনাথ যখন আর্জেন্টিনার কোনো নিজস্ব চরিত্র খুঁজে না পেয়ে বিব্রত হচ্ছিলেন, খানিকটা উষ্মা নিয়েই ভিক্টোরিয়া তখন ভেবেছেন বটে যে ইওরোপেই তাঁদের সত্যিকারের ঐতিহ্য; বাঁচায় আর চলনে, ভাষায় কিংবা গানে ইওরোপকেই উৎস ব'লে ঘোষণা করেছেন তিনি এই পনেরো বছর আগেও। অথচ, উত্তেজনার ওই মুহূর্তে ভিক্টোরিয়া হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন ১৯৩০ সালে কী তিনি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথকে, ভুলেই গিয়েছিলেন কোন্ প্রেরণা থেকে তাঁর *Sur* পত্রিকার সূচনা। ইওরোপ থেকে একদিন হয়তো নিজেদের মুক্ত করে নিয়ে দাঁড়াতে পারব' অথবা ইওরোপ থেকে 'আমাদের প্রত্যাশিত পরিপোষণ পাই না একেবারেই', ভিক্টোরিয়া ভুলে গিয়েছিলেন যে এও ছিল একদিন তাঁর নিজেরই কথা।

pathagar.net

বিরোধী এই দুই ভাবনার কোন্‌টিকে বলব ভুল? কোনোটিকেই নয়। বস্তুত, বিপরীতের এই দ্বন্দ্ব কেবল ভিক্টোরিয়ার নিজস্ব কোনো অন্তঃপ্রকৃতি নয়, এইটেই হলো এই শতাব্দীর আর্জেন্টিনার—না, কেবল আর্জেন্টিনার নয়, সমগ্র লাতিন আমেরিকার—সংকট। কী তাঁদের জাতিগত পরিচয়? ভাষা-সূত্রে তাঁরা কি স্পেনের সঙ্গেই আত্মীয়তা বোধ করবেন? কিন্তু স্পেন থেকে কি মুক্ত হতেই চাননি তাঁরা অনেকদিন ধ'রে? রাজনৈতিক সেই মুক্তি অর্জিত হবার পরেও কি তবে গোপনে রয়ে গেল কোনো সাংস্কৃতিক শৃঙ্খল? তবে কি তাঁরা আমেরিকার ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলাবেন নিজেদের? কিন্তু কোন্ আমেরিকা? কোন্‌টিকে বলা যায় আমেরিকার ঐতিহ্য? প্রাচীন আদিবাসীদের জগৎকে কি তবে ফিরিয়ে আনতে হবে? আরেক সংলগ্ন অঞ্চল থেকে হুইটম্যানকে লক্ষ ক'রে ব'লে উঠেছিলেন আরেক কবি, পাবলো নেরুদা[২৭]: আমাকে তুমি শিখিয়েছ আমেরিকান হতে! মাক্‌চু পিক্‌চুর শিখর থেকে তিনি অর্জন ক'রে নিচ্ছিলেন তাঁর দেশীয় পরিচয়।[২৮] এই শতাব্দীর সূচনা থেকে লাতিন আমেরিকার প্রধানতম ব্রত হয়ে উঠল এইটেই, এই আত্মজাতীয়তার সন্ধান, জীবনে আর শিল্পে।

আর সেইজন্যেই, যে-বোর্হেস[২৯] আজ ভাবেন যে ঐতিহ্য কথাটার মানে নেই কোনো, অস্তিত্ব নেই কোনো জাতিনির্ভর ঐতিহ্যের, যে-বোর্হেস দেখান যে কোরানকে সত্য ক'রে তুলবার জন্য সেখানে আরবীয় পরিবেশ সঞ্চারের দরকার হয়নি কোনো, কোরানে নেই উটের উল্লেখ;* যে-বোর্হেস মনে করেন যে ভাবে-ভাবনায় তাঁরা দু হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন কেবল ইওরোপের কাছে, কেননা, গোটা পশ্চিমি সভ্যতার উপরেই তাঁদের আত্মার পত্তন—সেই

* বোর্হেসের এই তথ্যটি অবশ্য একেবারেই ঠিক নয়, কোরানে উটের একাধিক উল্লেখ আমরা দেখেছি। প্রায় সূচনাতেই, যেখানে সূর্য তারা খ'সে যাবার বা পাহাড় উড়ে যাবার দুর্লক্ষণগুলি বলা আছে, সেখানেই পাব উটেরও প্রসঙ্গ। অথবা, অনেক পরে, কবিদের প্রসঙ্গে বলতে হলো: 'Your sign' he said, 'is this she-camel'। দ্র The Koran, tr. N. J. Dawood, Penguin, 1967, pp. 17, 202.

pathagar.net

বোর্হেসকেও বলতে হয় যে আর্জেন্টিনার ইতিহাস হলো স্পেন থেকে নিজেকে ছিন্ন ক'রে নেবারই ইতিহাস, সেই বোর্হেসকেও ১৯২১ সালের তরুণ বয়সে ইওরোপ থেকে ফিরে এসে মেতে যেতে হয় জাতীয় সত্তার সন্ধানে, তাঁরও কবিতার কেন্দ্র হিসেবে ঘুরে ঘুরে আসে গোটা আর্জেন্টিনা আর তার নস্টালজিয়া।

আত্মদ্বিধার এই লক্ষণ থেকে বোঝা যায় কেন সেদিনকার তরুণ কোনো মন হয়ে উঠবে প্রাচ্যমুখী। প্রাচ্যেও, বিশেষত ভারতবর্ষে, সেদিন চলছে এমনি এক সংকট, পশ্চিম থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজেকে আবিষ্কার ক'রে নেবার এমনি এক চর্যা। ১৯২০-২১এর আর্জেন্টিনা আর ভারতবর্ষের অনেক প্রভেদ নিশ্চয়, কিন্তু তবু গান্ধীর সত্যাগ্রহ অথবা আত্মনির্ভরতার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা একটা জায়গায় মিলিয়ে দিয়েছিল তাদের, অনেক মনকে সেদিন ঘুরিয়ে দিয়েছিল পৃথিবীর এই উত্থানোন্মুখ প্রান্তে। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর মতো অনেক সজীব মনই সেদিন অলক্ষ্য একটা সমান্তরাল খুঁজে পাচ্ছিল এদেশ-ওদেশের চলমানতায়, সাম্রাজ্যিক বন্ধন আর সাংস্কৃতিক পেষণ থেকে মুক্তি নিয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠার এই আয়োজন আকর্ষণ ক'রে আনছিল অনেকের সহানুভূতি।

ভিতরে দ্বিধা ছিল, ছিল অন্তর্বিরোধ। কিন্তু সেই বিরোধ থেকে উত্তীর্ণ হবার কি পথ নেই কোনো? যে-প্রত্যয় বিরোধকেই বড়ো ক'রে দেখায় না, বড়ো ক'রে তোলে উত্তরণ বা পরিণতিকে, বড়ো ক'রে তোলে সামঞ্জস্য, আর্জেন্টিনার তখন প্রয়োজন ছিল সেই প্রত্যয়ের। তাই স্পেনীয় কবি উনামুনো[৩০] জীবনের যে ট্র্যাজিক ধারণার কথা শোনান, তার চেয়ে বেশি আগ্রহ তৈরি হয় সেদিন রবীন্দ্রনাথের সাধনায়। ১৯১২ সালে উনামুনো জানালেন *Tragic Sense of Life*, আর তার ঠিক পরের বছরেই রবীন্দ্রনাথ ইওরোপকে শোনাচ্ছেন তাঁর *Sadhana*-র বক্তৃতাবলি। দুয়েরই লক্ষ্য এক অধ্যাত্ম পরিপূর্ণতা। কিন্তু উনামুনোর চেতনায় কেবলই বড়ো হয়ে ওঠে দ্বিধাচ্ছিন্ন কাতরতা আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর *Sadhana*-তে সহজেই দেখতে পান সেই চেতনা যা সমস্ত বিরোধিতা পেরিয়ে যায়, 'outweighs actual

Pathagar.net

contradictions!' এইভাবে কবি অতিক্রম ক'রে যান *The Problem of Evil*। শোয়াইট্‌জার[৩১] পরে যাকে বর্ণনা করেছিলেন 'thought-symphony' ব'লে, ভাবনার সেই সংগীত আর সংগতি এইভাবে আকর্ষণ ক'রে নিল অনেক পশ্চিমবাসীর মন, সেই পশ্চিমবাসী, যাঁরা বিপরীতের দ্বন্দ্ব থেকে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিলেন সেদিন। *Tragic Sense of Life*-এর তুলনায় *Sadhana* সেখানে আশ্রয় দেয় বেশি; বিক্ষোভের শান্তি, অন্বেষণের পরমতা বা হৃদয়গত মীমাংসার একটা সহজ পথ পেয়ে যেন বেঁচে যায় মন।

আর, এরই সঙ্গে এসে মেলে আর্জেন্টিনার কবিতাজগৎ, যে জগতে অল্পদিনের মধ্যে ঘ'টে গেছে আন্দোলনের কয়েকটি বড়ো বড়ো পর্যায়।[৩২] ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' যখন বেরুল (১৯১২) কিংবা তার স্পেনীয় অনুবাদ যখন ছাপা হচ্ছে (১৯১৯), আর্জেন্টিনার কবিতায় তখন *Modernismo* আন্দোলন পৌঁছল তার শেষ সীমায়। একদিন এই আন্দোলনের দাবি ছিল স্পেন থেকে নিজেদের সরিয়ে আনা, ফিরে আসা স্পেনীয় কবিতার ঐতিহ্য থেকে, আর সেই ঝোঁকে কবিরা আশ্রয় নিচ্ছিলেন ফরাসি পার্নেসীয় অথবা প্রতীকী কবিতার মণ্ডলে, তাঁরা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তখন নতুন ছন্দমিলের চারিত্র অথবা কিছু আহরণ করতে চাইছিলেন দূর প্রাচ্য জগৎ থেকে, হোক তা চীন বা জাপান। ১৯১৫ সালে ছাপা হয়েছে মরেনো'র নতুন কবিতার বই,[৩৩] যে-বইয়ের আদর্শ হলো সহজ সরল উচ্চারণ, স্নিগ্ধ আর প্রত্যক্ষ। আধুনিকবাদের ভিতর গ'ড়ে উঠছিল যেন এক অতি-অলংকারের প্রবণতা, তারই বিরুদ্ধে এই সরলতার অভিমান। 'আমার এ-গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার' রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার অনুবাদ তখন পৌঁছে গেছে পশ্চিমে, কদিনের মধ্যে স্পেনীয় কবি হিমেনেথও[৩৪] তৈরি করেছেন তাঁর নগ্ন কবিতার আদর্শ *Vino, Primero, Pura* (রচনা ১৯১৭ প্রকাশ ১৯১৮), আর, ১৯১৫ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে হিমেনেথদম্পতি স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করছেন রবীন্দ্রনাথের বাইশখানি বই।[৩৫] আর, ঠিক তার পরেই শুরু হলো বোর্হেসদের নতুন আন্দোলন *Ultraismo*, শহরের দেয়ালে দেয়ালে ছড়িয়ে দেওয়া হলো কবিতা,

কেননা কবিতাকে নাকি নামিয়ে আনতে হবে একেবারে বুয়েনস আইরেসের পথে পথে।

নতুন-কোনো-সন্ধানে উন্মুখ এই আর্জেন্টিনায় এসে পৌঁছবেন রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালের নভেম্বরে। এই সেই বছর, যখন চিলি থেকে পাবলো নেরুদার স্বর শোনা গেল দেশব্যাপী, তাঁর প্রথম প্রবল কবিতার বই ছাপা হলো 'কুড়িটি প্রেমের কবিতা'।[৩৬] সমগ্র লাতিন আমেরিকাকে মথিত ক'রে তুলল এ বই, কবিতায় এনে দিল এক ধারাবদল। ইওরোপ থেকে বোর্হেস ফিরে এসেছেন তার ঠিক তিন বছর আগে, সহযোগীদের নিয়ে গ'ড়ে তুলছেন তিনি নতুন আন্দোলন।[৩৭] আর এইসব নূতন উৎক্ষেপের পাশাপাশি আছেন ভিক্টোরিয়া (যিনি তাঁর *Sur* পত্রিকায় পরে টেনে নিয়েছিলেন আরো অনেকের সঙ্গে বোর্হেসকেও)। দেশের জন্য তাঁর আগ্রহ, ফরাসি রচনায় তাঁর রুচি, কিন্তু সেই ফরাসি দেশের নতুন রচনার ভ'রে ওঠে না তাঁর মন। ঠিক দুবছর আগে ১৯২২-এর নভেম্বরে মারা গেছেন যে প্রতিভাবান্, সেই প্রুস্তকে নিয়ে উত্তেজনা চলছে তখন সাহিত্যসংসারে।[৩৮] ভিক্টোরিয়াও সেই প্রুস্তের দ্বারস্থ। কিন্তু ফিরিয়ে দেন তাঁকে প্রুস্ত, সেখানে তাঁর প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই, হৃদয়ক্ষতির নেই কোনো প্রলেপ, যে-প্রশ্ন যে-ক্ষত নিয়ে গ'ড়ে উঠছিল নবীন আর্জেন্টিনা। প্রুস্ত থেকে স'রে আসেন তিনি রাস্কিনে[৩৯] আর রাস্কিন থেকে গান্ধী পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায় তাঁর মন, হয়তো তিনি লক্ষও করেন এক থেকে অন্যের দিকে যাবার পথটুকু। হয়তো তিনি লক্ষ করেন যে ছাত্রবয়স থেকে প্রুস্ত মগ্ন ছিলেন রাস্কিনের সৌন্দর্য আর নীতি-বোধে, হয়তো তাঁর মনে থাকে এই তথ্য যে গান্ধী কত গভীর বিনতিতে বলেন রাস্কিনের কথা, কীভাবে তাঁর জীবনে মস্ত এক প্রভাব এনে দেয় তাঁর বই—সেই কথা।[৪০] আর, মন যখন এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য, আত্মসন্ধানের বিহ্বলতায় মন যখন খুঁজে বেড়াচ্ছে কোনো আশ্রয়, দেখতে চাইছে নিরাভরণ সত্য কবিতার প্রাণময় উত্থান, সমস্ত বিরোধের পরপারে কোনো পরমতার শান্তি, জাতিগত প্রত্যয়ের মধ্যে জেনে নিতে চাইছে সর্বমানবতার সম্পূর্ণ উন্মেষ, ঠিক তখনই রবীন্দ্রনাথ

এসে পৌঁছলেন তাঁর অলিন্দটিতে, সান ইসিদ্রোর সাজানো সেই বাড়িতে। এইখানে আবার রবীন্দ্রনাথ ফিরে পাবেন তাঁর 'মন্থর মুহূর্তগুলি',[৪১] তাঁর অন্বিষ্ট অবকাশ। এইখানে আবার দিনে দিনে তাঁর 'সাজিখানি ভরে উঠবে ফুলে', যেমন তিনি ভিক্টোরিয়াকে লিখেছিলেন একটি চিঠিতে; হয়তো আরেক বিদেশি কবির মতো এইখানে এসে বুকভরা নিশ্বাস নিয়ে বলতে পারবেন তিনি আরেকবার: 'আবার ফিরে পেয়েছি তারে। কারে? শাশ্বতীরে!'[৪২]

আর ভিক্টোরিয়া? ভিক্টোরিয়া যে কী ফিরে পেলেন তাঁর নিজের অলিন্দে, দুমাস এই কবির সামীপ্যে, সেকথা আমরা জেনে নিতে পারি তাঁর এই স্মৃতির দলিলে, রবীন্দ্রশতবর্ষকে মনে ক'রে লেখা তাঁর ছোট্ট এই বইখানিতে: 'সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ।'

সেই বইটিরই এই অনুবাদ।

pathagar.net

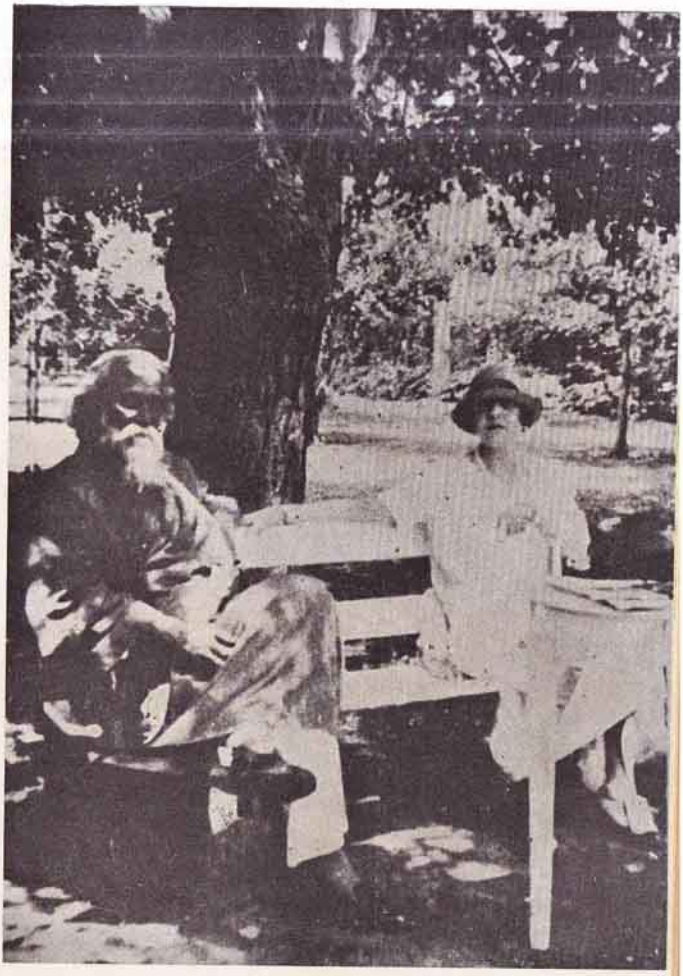

সান ইসিদ্রোর শিখরে

রবীন্দ্রনাথ

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

pathagar.net

রবীন্দ্রনাথের একজন বন্ধু
ভারতবর্ষের একজন বন্ধু
একজন ইংরেজ, বন্ধু
লেনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্টকে

pathagar.net

খোলা পথের ধারে

In the joy of your heart may you feel the living joy that sang one spring morning sending its glad voice across an hundred years.[১]

The Gardener

He is singing God's praise under the trees by the open road.[২]

Fruit Gathering

১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে শোনা গেল, বুয়েনস আইরেস হয়ে লিমা যাচ্ছেন[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর নিজের ইংরেজি থেকে অথবা জিদের ফরাসি অনুবাদ[৪] থেকে আমরা যারা জানতাম তাঁর রচনা, আমাদের তখন শুরু হলো প্রতীক্ষা! এখানে তাঁর আবির্ভাব সে-বছরের সব-সেরা ব্যাপার। আর আমার পক্ষে তো এটা জীবনেরই সবচেয়ে বড়ো ঘটনা।[৫]

এর মাত্র অল্প আগেই ছাপার অক্ষরে দেখতে শুরু করেছি নিজের রচনা। La Nacion পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত আমার তিনটে প্রবন্ধের বিষয় বেশ মনে রাখবার মতো : দান্তে, রাস্কিন আর গান্ধী।[৬] শেষ লেখাটি ছাপা হয়েছে ১৯২৪-এর মার্চ মাসে। চার নম্বর লেখার নাম হবার কথা : রবীন্দ্রনাথ পড়বার আনন্দ। এবার তাহলে আমার রচনাতালিকায় এল বাঙালি কবির পালা, আর তিনি সঙ্গও পেলেন ভালোই, একজন তো তাঁর স্বদেশবাসী। এই যে ফ্লোরেন্সীয় কবি, ইংরেজ প্রাবন্ধিক আর সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুখোমুখি দাঁড়ানো এক নিরস্ত্র ভারতবাসী—লেখার বিষয় হিসেবে

এঁদের নির্বাচন ক'রে নেওয়াতে আমার কোনো যোগ্যতার প্রমাণ নেই, এর থেকে কেবল বোঝা যাবে আমার পছন্দের ধরনটা।

আরো এগোবার আগে, গোড়াতেই একটা কথা স্পষ্ট ক'রে নেওয়া ভালো। উত্তম পুরুষে যখন কথা বলছি আমি, বলছি আমারই আবেগ, আমার অভিজ্ঞতা, আমার অনুভব বা ভাবনার কথা—সে আমার অহংমন্যতার জন্যে নয়, এজন্যও নয় যে আমার মনোভাবকে খুব-কিছু অসাধারণ ব'লে ভাবছি আমি। বরং ঠিক উলটো। আমার পাঠকদের মনে রাখতে বলি ভিক্তর য়ুগোর[৭] একটি উক্তি: 'নিজের কথা যখন বলি, সে তো তোমারই কথা। তা তুমি বুঝতে পারো না কেন? হায়রে বোকা, ভাবছ যে তুমি আর আমি ভিন্ন মানুষ?' তেইয়ার দ্য শার্দ্যাঁ-র[৮] কথাগুলিও এখানে নিজের মতো ক'রে নিয়ে বলা যায়: 'স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, আমার এসব আবিষ্কারে আমার আপন সামর্থ্যের কোনো প্রমাণ নেই। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে মানবীয় আর ধর্মীয় স্পন্দন—মানুষ কেবল নিজেকে নূতন করে চিনে নিচ্ছে তার মধ্যে। আমারও বেদনা যে বেজে ওঠে ওই স্পন্দনে, এটুকুই আমার মূল্য।' মানবাত্মার অন্তরতর ঘরে সঞ্চিত থাকে এসব অভিজ্ঞতা। একে একটা প্রামাণিক চেহারা দিতে গেলে যে উত্তম পুরুষেই কথা বলতে হয়! এ-ধরনের আরো অনেক স্মৃতিকথার মতো আমার এটিও একটি দলিলমাত্র, আরেকজনের মহিমাকে আমি কেমন জেনেছি, তার দলিল।

সান ইসিদ্রোয় ১৯২৪ সালের সেই বসন্ত ছিল উষ্ণতায় ভরা, রৌদ্রবিভাময়। গোলাপে গোলাপে ছেয়ে গেছে দেশ। জানালা-খোলা ঘরে আমার সময় কাটছে রবীন্দ্রনাথ প'ড়ে, তাঁর কথা ভেবে, তাঁকে চিঠি লিখে—যদিও সে-চিঠি কখনোই ডাকে দেওয়া হবে না।

pathagar.net

সেই সেপ্টেম্বরে বাগানের সুরভিতে মিশে গিয়েছিল আমার উত্তেজনা। এইসব পড়া, ভাবনা, প্রতীক্ষা আর লেখা—তারই থেকে প্রস্তুত হলো La Nacion-এ প্রকাশিত রচনাটি। বস্তুত, এ যেন রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিই চেহারা নিল প্রবন্ধের। সেসব দিনে কখনো ভাবতেও পারিনি যে সান ইসিদ্রোর উপর একদিন আমারই অতিথি হবেন কবি। স্বপ্নের জগতের বাইরেও যে এমন সুখের ভাগ্য সম্ভব, তা কল্পনাই করা যেত না সেদিন। আর সে-ভাগ্য যখন আমার আসবে, কে জানত তখন তাকে মনে হবে নিতান্তই যেন স্বাভাবিক, আর, একেবারেই ভিন্ন-সব কারণে শুরু হবে আমার যন্ত্রণা!

সেই চিঠি বা প্রবন্ধ আজ আবার প'ড়ে দেখছি আমি। ছোটো বড়ো যেমনই হোক একটি বই লিখব রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, কেবলই এই ইচ্ছে লালন করেছি ব'লে আমার বইয়ের মধ্যে সে-লেখাটি নেই।[৯] যে রচনার কথা বলছি, তার মধ্যে ছিল দুই লেখকের তুলনা। একদিকে আমাদের অস্থির চঞ্চল পশ্চিমজগতের প্রতিভূ এক ফরাসি লেখক, অন্যদিকে এই বাঙালি কবি, যিনি কেবলই প্রাচ্যজগতের প্রতিনিধি নন, যিনি প্রাচী-প্রতীচীর মধ্যে গ'ড়ে ওঠা এক নবীন সেতু। অল্প খানিকটা তুলে দিই এখানে পুরোনো সেই লেখা থেকে।

১৯১১ সালে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতায় (‘চেতনা আর জীবন’ নামে[১০] ছাপা হয়েছিল পরে) আনন্দ বিষয়ে বলেছিলেন বের্গসঁ: ‘জীবনের তাৎপর্য আর মানুষের নিয়তি নিয়ে ভেবেছেন যেসব দার্শনিক, তাঁরা তেমন লক্ষ করেননি যে প্রকৃতি নিজেই আমাদের কতখানি বুঝিয়ে দেয়। প্রকৃতিই এক সময়ে স্পষ্ট চিহ্নে জানিয়ে দেয় যে আমরা আমাদের পরিণামে পৌঁছে গেছি। আনন্দ

pathagar.net

সেই চিহ্ন। সুখ নয়, আমি বলছি আনন্দ। সুখ হলো জীবনে টিকে থাকবার জন্য প্রকৃতির তৈরি এক উপায়। কিন্তু কিসের অভিমুখে চলেছে সেই জীবন, তার কোনো ইশারা পাই না এর থেকে। আর আনন্দ সব সময়ে বলছে যে জীবন ধন্য, জীবন পেয়েছে অনেক, জীবন জয়ী। যে-কোনো মহৎ আনন্দ থেকেই শুনতে পাওয়া যায় এক জয়ধ্বনি।'

একই কথা বলা যায় বই বিষয়ে। বই আছে দু' ধরনের। কোনোটিতে আমাদের সুখ, কোনোটিতে আনন্দ। যেমন ধরা যাক, 'সোয়ানের পথ'।[১১] এ বই প'ড়ে যে সময় কাটে তা আমার পক্ষে—হয়তো আরো অনেকের পক্ষেই—বড়ো সুখের সময়। এর চরিত্র-গুলির সঙ্গে যখন আত্মীয়তা ঘটে, তখন সে এক যন্ত্রণারও সময় বটে। কিন্তু তার সবটাই একেবারে আনন্দবিহীন। ভাগ্যে মানুষের জীবন বইছে প্রবল বেগে, তা নইলে কোনো কোনো অনুভূতির চাপ সে সহ্য করতে পারত না। সেইসব শিলীভূত অনুভবের কাছে আমাদের নিয়ে যায় প্রুস্তের প্রতিভা।

স্বপ্ন তার দ্রুত গতির মধ্যে কয়েক লহমাতেই ধরতে পারে একাদিক্রমিক বহু সংলাপ, বহু ঘটনা; সুদূরবর্তী নানা দেশ সেখানে মিলে যায় এক সঙ্গে—অথচ জাগ্রত জীবনে কত-না সময় লাগে এখান থেকে ওখানে পৌঁছতে। কোনো ক্যামেরাম্যানের মতো চেষ্টায় এমনি এক ভ্রমণকে যদি আমরা শ্লথ ক'রে দেখাতে পারতুম, প্রতিটি সংলাপে যদি ভ'রে থাকত তার হাজার তাৎপর্য আর উল্লেখপঞ্জি, প্রতিটি ঘটনাকে যদি দেখা যেত তার সমস্ত পুঙ্খে পুঙ্খে, যদি এইভাবে তাকে বিস্তারিত ক'রে নেওয়া যেত কয়েক বছরের মধ্যে, তাহলে কতই এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠত সেটা। আর তাহলেই আমরা চ'লে যেতাম প্রুস্তের খুব কাছাকাছি।

ওদেতের ভাবনাকে ঠিক-ঠিক সাজিয়ে তুলবার জন্য সোয়ানের অবিরাম ব্যর্থ প্রয়াসের কথা এমনই যথাযথ দীর্ঘতায় বলা হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত তা আমাদের শ্বাস রোধ ক'রে আনে। যাকে স্তাঁদাল[১২] বলেছিলেন 'amour passion', সেই বাসনাময় প্রেমের বেদনা আর কখনোই এত সূক্ষ্ম বোধের সঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয় নি। অর্তেগা-ই-গ্যাসেট[১৩] ঠিকই লিখেছিলেন : 'সোয়ানের ভালোবাসায় সব কিছুই অল্পস্বল্প আছে। আছে তপ্ত ইন্দ্রিয়ালুতার মুহূর্ত, অবিশ্বাসের ছায়া, বিষণ্ণ আচরণ আর অন্তরতম ক্লান্তির ধূসরতা। নেই কেবল একটি জিনিস, তার নাম প্রেম।'

কৈশোরে একজন সাঁতার শেখাতেন আমাদের, পাড় থেকে তিনি চিৎকার ক'রে বলতেন 'জলের নিচে শ্বাস নাও।' কী কৌশলে সেটা সম্ভব, তা অবশ্য তিনি শিখিয়ে দেন নি কোনোদিন, আমরাও এ পরামর্শ বড়ো-একটা কাজে লাগাই নি। হয়তো-বা তিনি ডুবসাঁতারই শেখাচ্ছিলেন। প্রুস্ত পড়তে গেলে সেই মহিলারই কণ্ঠস্বর মনে পড়ে আমার : জলের নিচে শ্বাস নাও। ভালোমানুষ সেই শিক্ষয়িত্রীটির উপদেশ পালন করাও যত কঠিন ছিল, ততই শক্ত সোয়ানের সংরক্ত প্রেমের জগতে নিশ্বাস নেওয়া। পাঠককে এ যেন একেবারে হাঁপ ধরিয়ে দেয়। আর যতবারই ঝাঁপ দেবার চেষ্টা করো-না কেন, ফলাফল ওই একই, বরং চাপটা আরো বাড়তেই থাকে। শেষ পর্যন্ত কোনো রকমে বন্ধ ক'রে ফেলতে হয় বই, বুক ভ'রে শ্বাস নেবার জন্য ফিরে আসতে হয় তীরে। কিন্তু আবার আমরা বই খুলি, কেননা অপ্রাপণীয়কে যেমনভাবে খুলে দেখাতে চেয়েছেন এই প্রতিভাবান, তাকে দেখে নেবার ইচ্ছেটাও বেশ চন্‌মনে।

আজ যাঁর বিষয়ে বলতে চাই আমি, তাঁর থেকে অবশ্য স'রে

pathagar.net

এসেছি অনেকটা দূরে। কলকাতা থেকে পারী যতদূর, যতদূর ময়দান থেকে বোয়া-দ্য-বুলোঞ্চন অথবা তাজমহল থেকে ভার্সাই। শৈশব থেকে পরিণত বয়সের যে ব্যবধান, সেই বিশাল দূরত্বের বেদনা জাগাতে চেয়েছিলেন বোদলেয়র তাঁর এক অতীতকাতর কবিতায় :

সেই শৈশব সবুজ স্বর্গ, ছিল গোপন
কত আনন্দ সরল স্বর্গে, তারা কি আজ
ভারত কিংবা চীনদেশ থেকে অনেক দূর ?[১৪]

কিন্তু না, এই দূরত্ব মায়া মাত্র। শৈশব বিষয়েও সেকথা যত সত্য, ততটাই তা সত্য ভারত বিষয়ে।

ঠিক এখন, এই একান্ত নিরানন্দ 'অতীত দিনের স্মৃতি'[১৫] উশ্‌কে নেবার পর রবীন্দ্ররচনায় প্রবেশ করবার আনন্দই হচ্ছে সবচেয়ে উপাদেয়, 'হৃদয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে' সবচেয়ে তৃপ্তিজনক।[১৬] প্রুস্ত হয়ে উঠবার পর এখন ভালো লাগবে অল্প সময়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার আনন্দ। হয়ে ওঠা, কেননা আমরা যে লেখা পড়ি তার চরিত্রের সঙ্গে নিজেদের তো এক ক'রেই তুলি, যে গান শুনি তার সুরের সঙ্গে মিলিয়েই নিই নিজেদের—যে ভয় করেছিলেন টলস্টয়।[১৭]

ঠিক, প্রুস্তের উপন্যাস থেকে আমরা স'রে আসছি রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। ধুলাচ্ছন্ন জীর্ণ পথিক পশ্চিমের মরুভূমি পেরিয়ে এবার যেন স্নান করতে পেল। যেন বিশাল এক নগরীতে দীর্ঘ অবস্থানের পর ছায়াময় গাছের নিচে ঠাণ্ডা বাতাস এল বুকে। সুন্দর আর মোহময় নগরী, কিন্তু তবু তার চারদিকে বিষাক্ত আবহ। অচেনা লোকেরা আমাদের জানে কেবল টুকরো টুকরো ক'রে, দেখতে পায় না আমাদের সমস্ত সত্তা। তাদের সঙ্গে পুরোটা দিন কাটানোর পর এ যেন এক বন্ধুজনের ঘরে এসে বসা।

'সাধনা' বইটি বিষয়ে হোয়াকিন গোন্‌জালেজ বলেছেন 'কবীর থেকে একশো কবিতা'র ভূমিকায়[১৮]: 'অধ্যাত্মতত্ত্বকে ঠিক এইভাবেই তো বুঝতে চাই আমরা।' হোয়াকিন গোন্‌জালেজের কাছে আর দূর রইল না ভারতবর্ষ। রবীন্দ্রনাথের রচনায় যাঁরা ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছেন তাঁদের কারো পক্ষেই সে-দেশ আর দূরের নয়।

প্রাচীন শাস্ত্রে আর আধুনিক জীবনচর্যায় অতীত ভারতের ধ্যান উদ্‌ভাসিত হয়ে আছে। যেসব পশ্চিমবাসী তার সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁদের দীক্ষা দেবার জন্যই 'সাধনা'র বক্তৃতামালা। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ভারতের ধর্মীয় রচনাবলি পশ্চিমবাসীদের পক্ষে নিতান্ত পুরাতাত্ত্বিক কৌতূহলের বিষয়,* কিন্তু তাঁদের নিজেদের পক্ষে এটা জীবনমরণের সমস্যা।[১৯]

আমার তো মনে হয়, উপনিষদ বা বুদ্ধের উপদেশমালা থেকে যাঁরা পুরাতত্ত্বের চেয়ে বেশি কিছু পান না তাঁরা নিশ্চয় বাইবেলও পড়েন নিতান্ত তার বাইরের অর্থে, ধরতে পারেন না এর গূঢ় তাৎপর্য। এসব সূত্রের বা এসব সূক্তের নিহিত অধ্যাত্ম ভাবনা অগম্যই থেকে যায় এ-ধরনের লোকের কাছে। হয় এঁরা নাস্তিক, মুক্ত বুদ্ধির মানুষ; আর নয়তো গোঁড়া, কুসংস্কারে ভরা। একদিক থেকে এ দু'দলই সমান।

উপনিষদ বলছেন, 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' ত্যাগের দ্বারাই লাভ করো, ভোগ করো। বলছেন, 'মা গৃধঃ' লোভ কোরো না।[২১] কিন্তু এ তো বাইবেলেরও কথা। ভিন্ন এক নক্ষত্রপুঞ্জের নিচে, ভিন্ন এক অক্ষে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই তো ভাবনা ব'য়ে চলেছে মানবপ্রবাহের উপর দিয়ে, একই তো কথার সম্প্রচার হৃদয় থেকে হৃদয়ে! এমনকী,

* রবীন্দ্রনাথ যখন এটা বলেছিলেন (১৯২১) তখনকার পক্ষে কথাটা সত্যি ছিল।[২০] এখন আর তা নয়।

pathagar.net

প্রবল বাধা অতিক্রম ক'রে একই রকম সামর্থ্যভরে তাঁরা খুঁজে নিতে চান সেই পথ যা মানুষের অজানা এক জগতে গিয়ে মিলেছে। 'সাধনা'র যা ভাবনির্যাস, সেণ্ট টমাস[২২] তাকেই না বলছেন 'মিলনক্ষুধা'।[২৩]

'গীতাঞ্জলি'র অনবদ্য অনুবাদের জন্য ফরাসিরা যাঁর কাছে ঋণী সেই জিদ বলেছিলেন যে এ-বইয়ের কবিতা পড়বার জন্য পশ্চিমের পাঠকদের প্রয়োজন নেই কোনো বিশেষ প্রস্তুতির।[২৪] ঠিক এই একই কথা বলা যায় রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা বিষয়ে। তবে আমার মনে হয়, কোনো বিদগ্ধ প্রস্তুতির যদিও প্রয়োজন নেই, তবু একে আয়ত্তে আনবার জন্য দরকার বয়সনিরপেক্ষ এক আত্মিক সচেতনতার, এক ধরনের সূক্ষ্ম বোধের।

রবীন্দ্রনাথের সব নাটকের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে স্বতন্ত্র হলো 'চিত্রা'।[২৫] মহাভারত থেকে সংগৃহীত এর কাহিনী। চিত্রা ছিলেন মণিপুররাজকন্যা। রাজা তাঁকে গ'ড়ে তুলেছিলেন পুত্রের মতো। পুরুষবেশী চিত্রা একদিন অরণ্যমধ্যে দেখতে পেলেন অর্জুনকে, তাঁকে ভালোবাসলেন। অর্জুন কিন্তু তত লক্ষই করেন নি তাঁকে। উৎকণ্ঠায় আকুল চিত্রা বর চাইলেন প্রেম আর অনন্ত-যৌবনের দেবতার কাছে, যেন অর্জুনকে প্রণত করবার মতো দীপ্তিমান সৌন্দর্যের অধিকারী হন তিনি। এক বছরের জন্য দেবতারা মঞ্জুর করলেন তাঁর প্রার্থনা। অর্জুন ধরা দিলেন জালে, আর অজ্ঞাত-কুলশীল এই নারীকে ভালোও বাসলেন। কিন্তু অচিরে চিত্রা বুঝে নিলেন যে তাঁর এক বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হয়েছে, সে তাঁর নিজেরই দেহ। এদিকে অর্জুন চিত্রার পরিচয় না জেনে ক্রমে অস্থির হয়ে উঠছেন। প্রেয়সীকে তিনি জানাতে বলছেন নাম; কেননা তাহলে তিনি সুখের চেয়ে স্থায়ী কিছু পাবেন যা এমনকী দুঃখের

মধ্যেও থাকবে বেঁচে। স্বভাবতই, অর্জুন চিত্রার কাছে প্রার্থনা করছেন আনন্দ, সেই আনন্দ, যার কথা বলেছিলেন বের্গসঁ, যা মলিন হয় না দুঃখভারে। বছর এখনো শেষ হয় নি, কিন্তু বাহুবন্ধনে যা বাঁধা পড়ে না, চুম্বনের দ্বারা যা মেলে না, তাকে আর অর্জুন খুঁজে পাচ্ছেন না চিত্রার মধ্যে। এল অন্তিম রাত্রি। শেষ দৃশ্যে দেহসৌন্দর্যের জাদুচ্যুত চিত্রা অর্জুনের প্রত্যাখ্যাত সেই নারীর রূপে ফিরে গেলেন, ব'লে দিলেন তাঁর নাম, তাঁর ইতিহাস। বললেন :

যদি পার্শ্বে রাখো
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করো
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে করো সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।[২৬]

রচনাটি শেষ হচ্ছে অর্জুনের এই সংলাপে : 'প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি'। এতদিনে অর্জুন আর চিত্রা যা চাচ্ছিলেন তা পেলেন। অন্য শব্দের অভাবে তার নাম বলা যাক, আনন্দ। সেই আনন্দ, যার মধ্যে অশ্রুবিন্দু দেখেছিলেন পাস্কাল,[২৭] সব মধুরতার চেয়ে বড়ো যে আনন্দ।[২৮]

আবার আমাদের সামনে ভেসে উঠছে সোয়ানের মুখ, করুণ, আতুর, ইন্দ্রিয়ালু। এই মুখে কেবলই ছায়া পড়ছে অনিত্য মায়ার, লালসার, যন্ত্রণার। এ হলো এক সীমাবদ্ধ হৃদয় যা নিজেকে একেবারেই বিলিয়ে দিতে পারে না, যা কেবল দম্ভভরে দাবি করে দয়িতের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

নিত্য এবং দৈব সত্তা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় অর্জুন অতিক্রম ক'রে গেলেন বস্তুর মায়ারূপ। আর সোয়ান গেল ভ্রষ্ট হয়ে। বৃহদারণ্যক

pathagar.net

উপনিষদে পড়েছি আমরা : যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্?[২৯] অর্জুন—এবং তাঁকে কণ্ঠ দিয়েছেন যে মহাকবি—তাঁদের দুজনেরই ওই আর্তনাদ। তাঁর প্রাঞ্জলতম কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথের ওই একই আর্তি। যেমন এই একটি :

তুমি মোরে পারো না বুঝিতে ?
প্রশান্ত বিষাদভরে
দুটি আঁখি প্রশ্ন করে
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে,
চন্দ্রমা যেমনভাবে স্থির নত মুখে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে।

কিন্তু আমি করি নি গোপন।
যাহা আছে সব আছে
তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন।
দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা
তাই মোরে বুঝিতে পারো না ?

এ যদি হইত শুধু মণি,
শত খণ্ড করি তারে
সযত্নে বিবিধাকারে
একটি একটি করি গণি
একখানি সূত্রে গাঁথি একখানি হার
পরাতেম গলায় তোমার।

এ যদি হইত শুধু ফুল
সুগোল সুন্দর ছোটো,

pathagar.net

উষালোকে ফোটো-ফোটো,
বসন্তের পবনে দোদুল,
বৃন্ত হতে সযতনে আনিতাম তুলে—
পরায়ে দিতেম কালো চুলে।

এ যে সখী, সমস্ত হৃদয়।
কোথা জল, কোথা কূল,
দিক হয়ে যায় ভুল,
অন্তহীন রহস্য নিলয়।
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জানি রানী
এ তবু তোমার রাজধানী।

কী তোমারে চাহি বুঝাইতে?
গভীর হৃদয় মাঝে
নাহি জানি কী যে বাজে
নিশিদিন নীরব সংগীতে—
শব্দহীন স্তব্ধতায় ব্যাপিয়া গগন।
রজনীর ধ্বনির মতন।

এ যদি হইত শুধু সুখ,
কেবল একটি হাসি
অধরের প্রান্তে আসি
আনন্দ করিত জাগরূক।
মুহূর্তে বুঝিয়া নিতে আনন্দবারতা,
বলিতে হত না কোনো কথা।

pathagar.net

এ যদি হইত শুধু দুখ,
দুটি বিন্দু অশ্রুজল
দুই চক্ষে ছলছল,
বিষণ্ণ অধর, ম্লান মুখ
প্রত্যক্ষ দেখিতে পেতে অন্তরের ব্যথা
নীরবে প্রকাশ হত কথা।

এ যে সখী, হৃদয়ের প্রেম,
সুখ দুঃখ বেদনার
আদিঅন্ত নাহি যার—
চিরদৈন্য, চিরপূর্ণ হেম।
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিন রাতে।
তাই আমি পারি না বুঝাতে।

নাই-বা বুঝিলে তুমি মোরে।
চিরকাল চোখে চোখে
নূতন নূতনালোকে
পাঠ করো রাত্রি দিন ধরে।
বুঝা যায় আধ প্রেম আধখানা মন—
সমস্ত কে বুঝেছে কখন?[৩০]

যাকে আমরা ভালোবাসি, তার হৃদয় সম্পূর্ণ ক'রে না জানবার সান্ত্বনাতীত বেদনা, আমাদের হৃদয় সম্পূর্ণ ক'রে জানাতে না পারিবার বেদনা—এসব যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে শুনি, তখন, কেন সেটা হয়ে ওঠে না তিক্ত দুঃখের বিষয়? তিক্ততার পরিবর্তে কী অসীম প্রত্যয়! দুঃখের পরিবর্তে কী কমনীয় প্রলেপ! সোয়ানের আতুরতায় ছিল যে বিরামহীন সংশয় আর ক্লেশ, তার থেকে নিজেদের কতই মুক্ত দেখতে

পাই আমরা। আর মনের সেই বিক্ষোভের দিকে যদি ফিরে তাকাই এখন, মনে হবে যেন এ আমাদের সত্তার নিতান্তই এক বহিরঙ্গ।

যত ছিল পথ আর পাথেয়, সেদিন
খুলে দিয়েছিলে তুমি, তুমিই আমার
সকল বাঁধন খুলে করেছ স্বাধীন।[৩১] [দান্তে]

'অতীত দিনের স্মৃতি'তে তাহলে এবার আমরা জুড়ে দিতে পারি নতুন এক বেদনাময় প্রতীকনাম, শুনে ছল্‌কে উঠবে আমাদের আনন্দ। 'সোয়ানের পথ' নয়, সে নাম হলো : রবীন্দ্রনাথের পথ।

এসব কথা লিখেছিলাম ১৯২৪ সালে। আজ মনে হয় প্রুস্তকে যদি জানতেন রবীন্দ্রনাথ, তাহলে 'সাধনা'র এই অনুচ্ছেদের[৩২] চেয়ে যোগ্যতরভাবে তাঁর বিষয়ে বর্ণনা করতে পারতেন না তিনি '…in modern European literature we miss the complete view of man which is simple and yet great. Man appears instead as a psychological problem, or as the embodiment of a passion that is intense because abnormal, being exhibited in the glare of a fiercely emphatic artificial light. When man's consciousness is restricted only to the immediate vicinity of his human self, the deeper roots of his nature do not find their permanent soil, his spirit is ever on the brink of starvation and in the place of healthful strength he substitutes rounds of stimulation. Then it is that man misses his inner perspective and

measures his greatness by its bulk and not by its vital link with the infinite....'

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, যেসব গান আমরা শুনি, আমরা নিজেরাই হয়ে উঠতে পারি সেই গান। সেই সুরময় পরিণতির কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে পারি আমরা। এর্নেস্ট আন্‌সেরমাট, প্রখর ধীমান্ এক অর্কেস্ট্রা-পরিচালক, আগে ছিলেন গণিতের অধ্যাপক, অল্প আগেই বলছিলেন আমাকে : কোনো বিষয় যখন রূপ পায় সংগীতের, কোনো মহৎ সুরের, তখন মিলিয়ে যায় দুঃখ আর সুখের প্রভেদ, মুছে যায় দুর্ভাগ্য আর সৌভাগ্যের স্বাতন্ত্র্য। সংগীতের ভাষায় সঞ্চারিত হয়ে এলে সবই হয়ে ওঠে আনন্দ। সে কি এইজন্যে যে সুরের ব্যাপ্তি আর গভীরতা আমাদের নিয়ে যায় এক অপরিমেয় গহন লোকে? রবীন্দ্রনাথ তাই মানতেন। কিন্তু সে কেবল গানেরই বেলায় নয়। তিনি বলতেন, ভালোবাসা এক অন্তহীন রহস্য, কেননা ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো কিছু দিয়েই তাকে বোঝা যায় না। আরো বলতেন, প্রেম যখন সমস্ত সীমাকে অতিক্রম ক'রে যায়, কেবল তখনই সে পায় সত্যকে। এই শেষ কথাটি তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু কবীরের কাছে।[৩৩]

এটা খুব আশ্চর্যের যে প্রুস্ত অসীমের সঙ্গে প্রাণময় যোগ অনুভব করেন একমাত্র তখনই (অন্তত, একমাত্র তখনই তিনি তা স্বীকার করেন) যখন তিনি সংগীতের কথা বলেন।[৩৪] 'আমাদের হৃদয়ের সেই বিশাল গোপন অবশ রাত্রি, যাকে আমরা নাম দিয়েছি নাস্তি, যাকে বলি শূন্যতা'[৩৫] তার বিষয়ে ভাবতে ভাবতে, সংগীত কীভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরে তার গোপন সম্পদ সেকথা বলতে বলতে, প্রুস্তও দেখান যে কোনো-কোনো সুরের টান যেন অসীম সত্যের সঙ্গে বাঁধা। হয়তো আমাদের পরম সত্যই এই নাস্তি, দীর্ঘশ্বাসে বলেন প্রুস্ত,

হয়তো কোনো অস্তিত্ব নেই আমাদের স্বপ্নের। কিন্তু যদি আমরা ধ্বংস হয়ে যাই, আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব এই অলৌকিক মুহূর্তগুলিকে, আর এদের সঙ্গে পেলে 'মৃত্যু হয়তো আর তত দুর্বিষহ লাগবে না, তত অসম্মানের মনে হবে না, হয়তো তত নিশ্চিতও মনে হবে না তাকে'।[৩৬]

'হয়তো তত নিশ্চিতও মনে হবে না তাকে।' এই স্বীকারোক্তি যেন জোর ক'রে আমরা ছিনিয়ে নিচ্ছি প্রুস্তের কাছ থেকে। তত দুর্বিষহ নয়, তত অসম্মানের নয়, এ পর্যন্ত হয়তো বলা সহজ। কিন্তু কথাটির শেষে আমরা শুনছি 'তত নিশ্চিতও নয়'। নিশ্চয় অনেক কষ্টেই তিনি বলতে পেরেছিলেন এই কথা।

বহুশ্রুত কোনো সোনাটার কয়েক কলি হঠাৎ শুনতে পেলে অমনি যেন জেগে ওঠে সমগ্র অতীত, অবসন্ন হয়ে আসে আমাদের হৃদয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যেন সামনে চ'লে আসে সোয়ান—অর্থাৎ প্রুস্ত। শুনতে পেই আমরা বিষাদের কী জাদু, দুঃখের কত দম্ভ! সঙ্গে সঙ্গেই প্রুস্তসোয়ান আমাদের বোঝাতে চান যে সংগীত উন্মোচিত ক'রে দিয়েছে তাঁর আপন হৃদয়ের ঐশ্বর্য, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝতে পারেন মহান্ সুরশিল্পীদের কাছে কত গভীর আমাদের ঋণ। এই সুরশিল্পীরা কেবলই খুঁজে ফিরেছেন অজানা ঘন অন্ধকার, আর সেখান থেকে আমাদের তাঁরা এনে দিয়েছেন লুকোনো কত দ্যুতি।

অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত এই আলোই তো আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের কবিতার কাছে আমরা ঋণী, অন্তত আমি, কেননা তাঁর কবিতা আবিষ্কার করছে এই রশ্মি, তার তাৎপর্য, আনন্দের তাৎপর্য। সমস্ত জীবন জুড়ে এর চেয়ে আর কোন্ বড়ো আবিষ্কার কেউ করতে পারেন? সেইজন্যেই এসব কথা এক চিঠিতে লিখতে চেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথকে, সেটা হয়ে দাঁড়াল এক প্রবন্ধ। সেইজন্যেই তাঁকে

আমি স্বাগত জানাতে চেয়েছিলাম এই একটিমাত্র শব্দের উচ্চারণে : আনন্দ।

পশ্চিমবাসীদের অনেকেই তাঁর কাছে কত-যে পেয়েছেন, আজ এই শতবর্ষে সেকথা প্রকাশ্যে স্মরণ করবার প্রয়োজন আছে। আর আমার ইচ্ছে যে এই স্মৃতিগুলি পৌঁছয় সেই দেশের মানুষের কাছে যেখানে তাঁর জন্ম, তাঁর মৃত্যু। এর সবচেয়ে ভালো উপায় হলো তাঁকেই আরেকখানা নতুন লিপিকা পাঠানো, তাঁরই সঙ্গে কথা বলা আরেকবার। গোলাপে-ভরা সেই বসন্তদিনের মতো আজও তিনি আমার খুব একান্তে, কেননা তিনি আমাকে নিয়ে গেছেন মায়া থেকে সত্যে, পৌঁছে দিয়েছেন এক আত্মিকতার ভূমিতে।

pathagar.net

অলিন্দ

Lovers, while they await one another, shall find, in murmuring them (the poems), this love of God a magic gulf wherein their own more bitter passion may bathe and renew its youth.[১]

Yeats

.....Thou didst press the signet of eternity upon many a fleeting moment.[২]

Rabindranath

অল্প বয়সে আমাদের সবারই জীবনে এমনসব সংকটকাল আসে, যার থেকে আর বেরুতে পারব ব'লে মনে হয় না। ঠিক তেমনি এক সময়ে 'গীতাঞ্জলি' এল আমার হাতে, এ বই প'ড়ে ওঠা আমার পক্ষে তাই দ্বিগুণ মূল্যবান হলো। ছোটো এই বইটির সান্নিধ্য পাবার এর চেয়ে ভালো সময় আর কী হতে পারত! নির্দয় আঘাতশীল খুদে খুঁতখুঁতে এক সংকীর্ণ ঈশ্বরকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমার ওপর, সে-ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস ছিল না একেবারে। জীবনের একটা মস্ত অংশ জুড়ে বসেছিল এই অবিশ্বাস, আর সেই মস্ত অংশে ব্যাপ্ত এক বিশাল শূন্যতা, ঈশ্বর তাঁর নাস্তিত্ব নিয়েই সেখানে নিরন্তর বিরাজ করছেন। এই নাস্তি যেন অহরহ বলে: সবকিছু বলতে পারো আমায়, একমাত্র আমারই সঙ্গে কথা বলতে পারো তুমি। আমাকে যদি ছেড়ে দাও, হারিয়ে যাবে নিঃসঙ্গতায় তোমার অতিমানবিক কাতরতা বুঝতে পারেন কেবল কোনো দেবতা।

মনের এই অবস্থায় মেলে ধরলাম 'গীতাঞ্জলি':

বিধিবিধান-বাঁধন ডোরে
ধরতে আসে, যাই যে সরে
তার লাগি যা শাস্তি নেবার
নেব মনের তোষে।
প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে।[৩]

তাঁর কবিতাবলিতে যে-প্রেমের কথা বলেন রবীন্দ্রনাথ, হয়তো আমার কাতরতা সে-প্রেমের জন্য নয়। কিন্তু যাঁর উদ্দেশে তিনি তা নিবেদন করেন, তাঁর কাছে অশাস্ত্রীয় বা পবিত্র সব প্রেমেরই কথা বলা যায়। ক্যাথলিকপ্রবর পেগি-র[৪] ধারণায় এ প্রেম হলো অন্যতর কোনো ভালোবাসার 'সূচনা আর প্রতিফলন', অন্য কোনো ভালোবাসার 'অবয়ব আর পরীক্ষা'। শিরাধমনীর রক্তপ্রবাহ আমাদের টেনে রাখে এক গুরুভার ঐহিকতার দিকে, এই ভালোবাসা এলে ঘুচে যায় তার টান। যেন আমিও ছিলাম সেই 'অবসন্নদের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া এক শিকার', যাদের জন্য প্রার্থনা করেন পেগি! নিতান্ত তুচ্ছ মৃন্ময় আমার অস্তিত্ব, এ আমি জানতাম। আর সেই জন্যেই এত দূরের অধিজগৎ থেকে এলেও কবিতাগুলিকে আমার বিদেশি মনে হয়নি, সেইজন্যেই এগুলি প'ড়ে আমি মথিত হয়ে উঠছিলাম আনন্দেবেদনায়:

সংসারেতে আর যাহারা
আমায় ভালোবাসে
তারা আমায় ধরে রাখে
বেঁধে কঠিন পাশে।

pathagar.net

তোমার প্রেম যে সবার বাড়া,
তাই তোমারই নতুন ধারা—
বাঁধো না কো, লুকিয়ে থাকো
ছেড়েই রাখো দাসে।[৫]

রবীন্দ্রনাথের ভগবান! তুমি কিছুই লুকোতে চাও না আমার থেকে, ভয় পাও না যে তোমায় আমি ভুলে যাব, তোমাকে উপেক্ষা দিলেও তুমি আমাকে আঘাত করো না। এ ঈশ্বর জানেন, যে-কোনো স্বাধীন পথ দিয়েই চলি না কেন আমি, তা ঠিক পৌঁছে দেয় তাঁরই কাছে। এই এক ঈশ্বর, যিনি আমাকে সবটাই বোঝেন আর আমি যাঁকে বুঝি না কিছুই :

তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধন ক্ষয়
আমি ছাড়ব সকল ভয়।[৬]

ঠিক কোথায় কখন এইসব ভাবনা এল আমার মনে, তাও যেন আজ স্পষ্ট মনে করতে পারি : হালকা ধূসর রেশমের ট্যাপেস্ট্রি-ঘেরা এক ঘর, তার ভিতরে শ্বেতমর্মর এক ফায়ারপ্লেসে ঠেস দিয়ে আছি। বাড়িটি এখন আর নেই। সেদিন আমার চারপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও নেই আজ : নেই সেই কবিও, যে-কবির কণ্ঠস্বর আমাকে আপন-অশ্রুর অমূল্য উপহার এনে দিয়েছিল। প্রিয়তম বন্ধুর স্নেহ-আলিঙ্গনও আমায় দিতে পারেনি সে-উপহার। যেসব ছবি আজও আমার স্মৃতির মধ্যে তুফান তোলে সে সবই খুব সহজে অবারণীয়ভাবে মিলিয়ে যাবে একদিন, যেমন শূন্যতায় মিলিয়ে গেছে আরো সব ছবি। কিন্তু থেকে যাবে 'গীতাঞ্জলি', যে-গীতাঞ্জলি এমন ক'রে সেদিন কাঁদিয়েছিল আমায়।

ঠিক জানি না, রবীন্দ্রনাথ না কি ঈশ্বর, কার কথা ভেবে ব'লে উঠেছি তখন :

যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাইনি, যেন
সেকথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।[৭]

এক কবিতা থেকে আরেক কবিতায় উড়ে বেড়াচ্ছি মৌমাছির লুব্ধতায় :

হেরি অহরহ তোমার বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে।
সারানিশি ধরি তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়
পল্লবদলে শ্রাবণধারায়
তোমারি বিরহ বাজে হে।

ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায়
তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়
কত প্রেমে হায় কত বাসনায়
কত সুখে দুখে কাজে হে।
সকল জীবন উদাস করিয়া
কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমারি বিরহ উঠিছে ভরিয়া
আমার হিয়ার মাঝে হে।[৮]

pathagar.net

রবীন্দ্রনাথের ভগবান, এই বিরহের নাম জানি বা না জানি, কে আমরা সচেতন নই তার যন্ত্রণা বিষয়ে? আর, যেমন প্রতীচ্যে তেমন প্রাচ্যে, এই মিলনক্ষুধারই তো অন্য নাম ভালোবাসা![৯]

এইসব পড়াশুনো আর শিশুশোভন অশ্রুজল—এর দশ বছর পর ১৯২৪ সালের ৬ নভেম্বর এক বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রনাথ পৌঁছলেন বুয়েনস আইরেসে।[১০] রোম্যাঁ রলাঁর লেখা জীবনী[১১] থেকে গান্ধীর সঙ্গে আমার পরিচয় আর সশরীরে রবীন্দ্রনাথকে দেখার অভিজ্ঞতা, দুটো ঘটল একই বছরে। আরো অনেক আকস্মিক যোগাযোগের মতো এটিও আমার জীবনকে বিশেষভাবে চিহ্নিত ক'রে দিল। এতই স্পষ্টসব তরঙ্গরেখা তৈরি হলো তখন জীবনে যে আমার সন্দেহ হয় মোজেইকের কারুশিল্পের মতো আমাদেরও ভবিতব্য যেন পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে আছে।

প্লাতা নদীর জলে যখন প্রবেশ করলেন এই মহান্ সাম্ভী (এ-নামেই রবীন্দ্রনাথকে ডাকতেন মহাত্মাজী)[১২] ততদিনে আমি জেনে গেছি স্বরাজ অহিংসা সত্যাগ্রহ স্বদেশী ইত্যাদি শব্দ। দেশের মুক্তির জন্য সমান আবেগে আর পারস্পরিক শ্রদ্ধায় মিলিত এই যে দুটি মানুষ ভারতবর্ষকে গ'ড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের ভাবনার মূল প্রভেদগুলিও আমি জানতাম। রবীন্দ্রনাথ চাইতেন যতদূর সম্ভব প্রাচ্যপ্রতীচ্যের সহযোগ। কিন্তু গান্ধী ভাবছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাত থেকে ন্যায়বিচার অর্জনের অন্যতম পথ হলো নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, এইটেই তাঁর মতে একমাত্র বৈধ অস্ত্র। এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পালা শুরু হলো ১৯২০ সালে,[১৩] রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে পৌঁছবার চার বছর আগে। এই আন্দোলন, মনে হলো, কোনো কোনো দিক থেকে কবিকে বিচলিত করেছে। তিনি লিখেছেন: 'অন্য দেশ থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো দেশ বাঁচতে পারে না। হয় আমরা সবাই একসঙ্গে বাঁচব, আর নইলে আমরা একযোগে বিলীন হয়ে যাব সবাই।'[১৪] আমার মনে হয় না যে গান্ধীর আদর্শ বিষয়েই কোনো শঙ্কা ছিল তাঁর, গান্ধীকে তিনি সর্বকালের মহত্তম ব্যক্তিদের একজন ব'লে জানতেন। ভয় পেতেন তিনি গোঁড়া গান্ধীবাদীদের। নেতার হাত থেকে কোনো বাণী যখন সাধারণের কাছে পৌঁছয়, তার কী বিষম দুর্গতি ঘটে তা তিনি জানতেন।

গান্ধী লিখলেন: 'রবীন্দ্রনাথেরও উচিত আর সকলের মতো সচেতন হওয়া, বিদেশি পোশাক পুড়িয়ে ফেলা। দিনে দিনে এটা আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।'[১৫] রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পোড়ালেন না বিদেশি সুতোয় বোনা কাপড়, এবং বেশ জানি যে এ-ব্যাপারে খুব একটা সতর্কও হলেন না তিনি।

একদিকে গান্ধী, অন্যদিকে গুরুদেব। আমরা অনেকেই ধরতে পারছিলাম না কাকে বেছে নেব।[১৬] সুদূর রহস্যময় দেশের এ-দুই পথিক প্রায় একই সঙ্গে আবির্ভূত হলেন আমার জীবনে, বপন ক'রে দিলেন এই সমস্যা। শিল্পী, না কি সন্ত? বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে একজন পূর্ণতাকে দেখেছেন বিশ্ববিষয়ে, শিল্পকর্মে, তাঁর সৃষ্টিতে অর্থাৎ তাঁর নিজের বাইরে। শিল্পীর পক্ষে এইটেই স্বাভাবিক।* এবং

* 'আমার মধ্যে নিত্যই একটা গৃহযুদ্ধ চলছে। একদিকে আমার সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব, সে চায় নিঃসঙ্গতা; অন্যদিকে আমার আদর্শকামী ব্যক্তিত্ব, তার কাজ অন্য ধরনের, সে চায় বিশাল মানবসঙ্ঘের কাছে ব্যাপক সহযোগের ক্ষেত্র। আমার অন্তর্গত এই দুই বিরোধী অস্তিত্বের সংঘর্ষে জাগছে দ্বন্দ্ব। প-এর মতো ব্যক্তিগত মর্জি আর বাইরের পরিবেশের সংঘর্ষে এটা নয়। এ-দুই বিপরীত টান আমার মধ্যে আছে বলেই সুমস্থিতি সহজ সমাধান হিসেবে এর যে-কোনো একটিকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।' রোমাঁ রলাঁকে লেখা চিঠি, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪, বুয়েনস আইরেসে পৌঁছবার আট মাস আগে।[১৭]

আরেকজন দেখছেন নিতান্তই তাঁর কর্মে, অর্থাৎ তাঁর নিজের মধ্যে, সন্তের পক্ষে যা সংগত। একজন লেখক বা চিত্রী কেবল সেই পরিমাণে বড়ো, যতটা তিনি সুন্দরের (পূর্ণতার) সঞ্চার করতে পারেন তাঁর শিল্পে। তাঁর ব্যক্তিজীবন না-ও পেতে পারে সেই পূর্ণতা, এমন-কী তাঁর নিজের জীবন হতে পারে বেশ খানিকটা এলোমেলো। অপর পক্ষে, সন্ত যদি তাঁর নিজের জীবনকেই নিজের কৃতিকেই গ'ড়ে না তোলেন পূর্ণতায়, তাহলে তো তিনি সন্ত নন। তাঁর জীবনকেই হতে হবে শিল্প।

'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকায় ইয়েট্‌স আমাদের জানাচ্ছেন যে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তাঁরই স্বদেশবাসী কেউ একজন ইয়েট্‌সকে বলেছিলেন: 'আমাদের মহাত্মাদের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি জীবনযাপনকে অস্বীকার করেননি, যিনি বলেছেন বেঁচে থাকবার কথা। তাই তাঁকে এত ভালোবাসি আমরা।'[১৮]

শিল্প এবং সন্ত বিষয়ে এতক্ষণ যা বলেছি আমি, তার মানে এ নয় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্তার পূর্ণতা বিষয়ে ভাবিত ছিলেন না, অথবা সেই পরম পূর্ণতার কাছে মুহূর্তের জন্যও নিজেকে গৌণ দেখলে তাঁর বিবেকদংশন হতো না। বরং এইটেই যে ছিল তাঁর অনুক্ষণের দ্বন্দ্ব তা আমি জানি। বলতে পারি যে চোখের সামনেই এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ আমি অনেক দেখেছি। আমি কেবল বলতে চাই যে গান্ধীর কাছে সব কিছুই ছিল সরল, শিল্প আর কর্মের মধ্যে এই লড়াইটা তিনি একেবারেই জানতেন না, কবির পক্ষে যা ছিল নিত্যযন্ত্রণার। এই বিশ্বজাগতিক রূপসৌন্দর্যের প্রতি যে অগাধ সচেতনতা ছিল রবীন্দ্রনাথের, গান্ধীর তা একেবারেই ছিল না। তাঁর সামর্থ্যের সমস্তটাই গান্ধী সঞ্চয় ক'রে রেখেছিলেন কেবল আত্মিক সৌন্দর্যের জন্য। সাম্প্রতিক শতাব্দীতে ভারতবর্ষের দুই মিনার এই দুজন বিষয়ে

(আরেক চূড়া : নেহরু) এই তো আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

ফিরে যাবার পর লেখা তাঁর দুখানি চিঠি থেকে রবীন্দ্রনাথের এই দ্বন্দ্বছিন্নতার[১৯] আরো নিশ্চিত প্রমাণ পাচ্ছি। যখন তাঁর পাশে ছিলাম, খানিকটা ভিতর থেকে ধরতে পারছিলাম তাঁর নিঃশব্দ সংগ্রাম। ১৯২৫ সালের ১৩ জানুয়ারিতে লেখা প্রথম চিঠিটির শিরোলিপিতে ছিল 'জুলিয়ো চেজারে' জাহাজের ঠিকানা। চিঠির খানিকটা অংশ তুলে দিই এখানে : 'মনটা প্রায়ই গৃহকাতর হয়ে ওঠে ; সে যে কেবল দেশের জন্য তা নয়। সে আমার ভিতরকার সত্যে পৌঁছবার জন্য, যে-সত্য থেকে মেলে অন্তরতম মুক্তি। যখন কোনো কারণে মন খুব বেশি ক'রে নিজেরই দিকে স'রে আসে, তখন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যায় এই সত্যের চেহারা। আর যখন চারপাশ থেকে আহ্বান এসে পৌঁছয় আমার কর্মোদ্যমের প্রতি, সেই পরিবেশই হয়ে ওঠে আমার যোগ্য বাসা, কেননা তা আমাকে নিশ্চিতভাবে বিশ্বলোকের স্পর্শ এনে দেয়। আমার চেতনার মধ্যে এমন একটা নীড় নিশ্চয় আছে যেখানে আশ্রয় পায় বহিরাকাশ, আর আলোক এবং মুক্তির মতো এমন আর কোন্ আকর্ষণ আছে আকাশের। যখন অল্পমাত্রও টের পাওয়া যায় যে নন্দনের ঈর্ষাতুর প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠছে ওই নীড়, অমনি আমার চেতনা কোনো বাসাহারা পাখির মতো উড়ে চ'লে যায় দূরের তীরে। যখনই আমার মুক্তি বা আলো পলকের জন্য ঢাকা প'ড়ে যায়, তখন মনে হয় আমি যেন এক ছদ্মবেশের ভারে নুয়ে পড়েছি, কুয়াশা-ঢাকা সকালবেলার মতো। নিজেকে আর আমি দেখতে পাই না, আর বেদনার মতো এই অন্ধকার তার শূন্য ভার নিয়ে আমাকে চেপে ধরে। তোমাকে তো প্রায়ই বলেছি যে এই মুক্তিকে অগ্রাহ্য করবার মতো স্বাধীনতা আমার নেই, কেননা এ-মুক্তি আমার বিধাতাই দাবি করেন তাঁর আপন-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এমন অনেক

সময়ে হয় যে ভুলে গিয়েছি সেই দায়িত্ব, নিজেকে গড়িয়ে যেতে দিয়েছি কোনো স্বস্তিজনক বন্ধনে। কিন্তু প্রতিবারই এর অবসান ঘটেছে এক সর্বনাশে, বিধ্বস্ত প্রাকারের বাইরে এক খোলা প্রান্তরে আমাকে ছুঁড়ে দিয়েছে কোনো ক্রুদ্ধ শক্তি।

'নিশ্চিত জেনো, আমারই ভিতর দিয়ে পৌঁছয় আমার বাইরের এই আহ্বান। মায়ের জন্য শিশুর যে কান্না, তার এক গরিমাময় উৎস আছে। এটা তো কোনো ব্যষ্টির নয়, সমগ্র মানবতার এই কান্না। ঈশ্বরের হাত থেকে যারা কোনো বিশেষ বাণী বহন ক'রে আনে, তারাও এমন শিশুর মতো। তারা যে ভক্তি বা ভালোবাসা পায় সে তো আত্মসুখের চেয়ে বড়ো কোনো কারণে। কেবল ভালোবাসাই নয় অবশ্য, আরো আছে প্রত্যাঘাত আর অপমান, বর্জন আর প্রত্যাখ্যান। এসব কিন্তু তাদের ধ্বংস করবার ছল নয়, বরং এই আগুনের মধ্য দিয়েই তাদের জীবন আরো বড়ো দিব্য শিখা মেলে দিতে পারে।'[২০]

এ চিঠির অবশ্য একটা মানে আছে। রবীন্দ্রনাথের রোগশয্যায় তাঁর ইংরেজ সখা ও সচিব এল্‌ম্‌হার্স্ট[২১] আর আমার সুযোগ ঘটেছিল তাঁকে দেখাশোনা করবার। ডাক্তারি নির্দেশ আমরা হুবহু মেনে চলতাম। আমি খুব ধরলাম যে এই আরোগ্যসময়ে ওঁর আরো কিছুদিন সান ইসিদ্রোতেই থাকা উচিত (এর মধ্যে পরার্থপরতা যত ছিল, স্বার্থও তার চেয়ে কম নয়)। দুজনে এও বললাম যে অনুরাগী আর গুণগ্রাহীদের অত বেশি সময় দিয়ে নিজেকে ওঁর ক্লান্ত করাও ঠিক নয়। মনের এই ধরনটা হয়তো-বা একেবারে পশ্চিমি, কেননা রবীন্দ্রনাথ অভিমান ক'রে বসলেন যে আগন্তুকদের জন্য তিনি খোলা রাখতে পারছেন না দরজা। উলটোদিকে, আমার দেশবাসীরা এই ব'লে আমাকে দুষছিলেন যে কবিকে যেন এক বাগানবাড়িতে লুকিয়ে ফেলেছি আমি। কিন্তু দরজা যদি খুলেই রাখতুম সব সময়ে, নিশ্চয়

খুব অবসন্ন হয়ে পড়তেন কবি। আমরা তাই ঠিক করলাম, দেখা করবার সময়টা অন্তত কমিয়ে দিতে হবে। এইসব বাধানিষেধ কখনো শিথিল ক'রে কখনো কঠিন ক'রে কাটছিল দিন।

যে-দিন উনি ঘরে থাকতেন লেখাপত্র নিয়ে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে হয়তো একটু ঘুরে নিতেন বাগানে, স্পষ্টই দেখা যেত শারীরিক উন্নতি। কিন্তু ঐ, বিবেক নিয়ে ছিল ওঁর মুশকিল। এমন বিষণ্ণ জীবনযাপন তো ওঁর লক্ষ্য ছিল না! আর আমাদের লক্ষ্য ছিল ডাক্তারকে একেবারেই অবজ্ঞা না করা, আর তার মানেই, অমান্য করা রবীন্দ্রনাথকে।

উদ্‌বেগজনক এই ভাঙা স্বাস্থ্য এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ছিল তাঁর সঙ্গী।

সেই বছরেরই (১৯২৫) অগস্ট মাসে কবি শান্তিনিকেতন থেকে লিখছেন: 'সুইজারল্যাণ্ডে রোমঁ্যা রলাঁ এক সানাটোরিয়াম আবিষ্কার করেছেন তাঁর বাড়ির খুব কাছেই। ডাক্তারেরা যতদিন প্রয়োজন মনে করেন ওখানেই আমি থাকব।[২২] কত ভালো হতো সেখানে অভ্যর্থনা করবার জন্যে তুমি যদি থাকতে। হয়তো তা সম্ভব নয়।...লিখেছ যে নদীর ধারে সেই সুন্দর বাড়িটিতে গ্রীষ্মের শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে আসিনি ব'লে তোমার আক্ষেপ হয়। ভাবতেও পারবে না যে আমারও সেই ইচ্ছে কতটাই ছিল। সেই প্রেরণাময় আপাত-উষর আলস্যজোড়া শান্তির কোণ থেকে আমায় ছিনিয়ে আনল এক দায়িত্ববোধের মোহ। আজ দেখছি, যখন ওখানে ছিলাম, আমার ডালা দিনে দিনে ভ'রে উঠছিল ফুলে, মন্থর প্রহরের ছায়াতলে জেগে-ওঠা কবিতায়। তোমাকে বলতে পারি, বহু শ্রমে গড়া আমার লোক-হিতের সৌধাবলি লোকে যখন ভুলে যাবে, তারও অনেকদিন পর এই কবিতা বেঁচে থাকবে তার সমস্ত সতেজতা নিয়ে।'[২৩]

এই দুটি চিঠি ঠিক-ঠিক ধরিয়ে দেয় অনুভূতির কোন্ বিশিষ্ট

pathagar.net

ধরনের কথা আমি বলছিলাম। একদিকে আছে শ্রদ্ধেয় দায়িত্ববোধ, তাঁর বিধাতার কাজে লাগবার জন্য নিজেকে শর্তহীনরূপে সমর্পণ, যে কর্তব্যের ভার ঈশ্বর তাঁকে দিয়েছেন তার নিপুণ সম্পাদন। আর অন্যদিকে আছে এই উপলব্ধি যে চাপিয়ে দেওয়া এ দায় এক মোহমাত্র। তাঁর ধারণা যে সেই মোহই তাঁকে থাকতে দেয় না এমন শান্তির নিকেতনে যেখানে আপাত-আলস্যের মধ্যে তিনি খুঁজে পান কবিতা-রচনার প্রগাঢ় প্রেরণা। তিনি জানতেন, সতেজ সেই কবিতা তাঁর পরিশ্রমে-গড়া লোকহিতের মিনারগুলিকে অতিক্রম ক'রে যাবে একদিন।

কিন্তু এসব চিঠিপত্র তো সান ইসিদ্রো থেকে ফিরে যাবার পরে লেখা। বরং আমরা নভেম্বরের সেই দিনগুলিতে ফিরে যাই, যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা গায়ে নিয়ে আমাদের ঘাটে নামলেন কবি। তাঁর কাছা-কাছি থাকব, এ-রকম ইচ্ছে ছিল প্রবল, কিন্তু ততটা আশা করিনি কখনোই। এই অসুস্থতার ফলে ঘ'টে গেল তেমনি এক সুযোগ।

আমার এক বন্ধু[২৪] আর আমি ঠিক করলাম যে তাঁকে দেখতে যাব, তাঁর স্বাস্থ্য বিষয়ে খোঁজখবর নেব প্লাজা হোটেলে। রবীন্দ্র-নাথের সেক্রেটারি ছিলেন এক নীলচোখ ইংরেজ, দীর্ঘ দোহারা চেহারা, খড়্গের মতো নাক—লেনার্ড কে. এল্‌ম্‌হার্স্ট। তিনি আমাদের নিচে বসালেন আর তাঁর দুর্ভাবনা বিষয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। ভালোরকম পরীক্ষা ক'রে ডাক্তাররা তাঁদের মতামত জানিয়েছেন : রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের এমন অবস্থা নয় যে আন্দেস পেরিয়ে যাত্রা করা চলে। তাই তাঁর লিমা যাবার পরিকল্পনা আপাতত ছেড়ে দেওয়া ভালো। প্রেসিডেন্টকে[২৫] তার ক'রে দেওয়া দরকার যে তাঁর অতিথি পেরু পর্যন্ত পৌঁছতে পারছেন না। নতুন ক'রে জাহাজে উঠবার আগে কোনো গ্রামাঞ্চলে বিশ্রাম নিতে হবে কবিকে।

এসব শুনে হঠাৎই আমি প্রস্তাব ক'রে বসলাম এল্‌ম্‌হার্স্টের কাছে, ওঁরা দুজন এসে সান ইসিদ্রোতে থাকুন না কেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারের জন্য পুরো একটি বাড়ি ছেড়ে দেওয়া যাবে। কথা তো দিলাম, কিন্তু এই কথা রাখবার জন্য কীভাবে কী ব্যবস্থা করব সেসব তখনো ভাবিনি। সান ইসিদ্রোতে আমার নিজের কোনো বাড়িই ছিল না, আমার মা-বাবা তাঁদের বাড়িটা ধার দিতে রাজি হবেন কি না সে-বিষয়েও নিশ্চিত ছিলাম না খুব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর আরোগ্যের জন্য একটা পছন্দসই শান্তির নিবাস যাতে পান, তার জন্য স্বর্গমর্ত্য তোলপাড় করতে তৈরি ছিলাম আমি।

শ্রীযুক্ত এল্‌ম্‌হার্স্টের সঙ্গে প্রাথমিক এই কথাবার্তার পর আমরা পৌঁছলাম রবীন্দ্রনাথের ঘরে। সেখানে আমাদের একলা রেখে চ'লে গেলেন সেক্রেটারি। ভয়ে ভয়ে আমি ভাবছি, কী লাভ এই দেখাশোনায়? একটা কথাও বলছি না। ভীরু মানুষেরা সমস্ত জীবন ভ'রে সবচেয়ে বেশি ক'রে যা চায়, ভাগ্য তাকে প্রায় আয়ত্তের মধ্যে এনে দিলে ভয় পেয়ে যায় তারা। আমাকেও চেপে ধরল সেই ভয়, ইচ্ছে হলো পালিয়ে যাই।

আমার এত আকুলতার যিনি কারণ, এই অস্বস্তিজনক প্রতীক্ষার দ্রুত অবসান ঘটালেন তিনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এলেন; নীরব, সুদূর, তুলনাহীন বিনীত। ঘরে এসে তিনি দাঁড়ালেন, আবার এও সত্যি যে ঘরে যেন তিনি নেই। তাঁর ধরনধারণে একটা ঔদ্ধত্যও ছিল, খানিকটা যেন লামার মতো।* লামার দিকে কেউ তাকালে ওরা যেমন তাদের তাচ্ছিল্য নিয়ে দেখে, অনেকটা সেই রকম! কিন্তু ওই ঔদ্ধত্যেরই সঙ্গে আছে এক সর্বহারী মাধুর্য। তেষট্টি বছর বয়স, প্রায় আমার বাবার বয়সী, অথচ কপালে একটিও রেখা নেই, যেন

* দক্ষিণ আমেরিকায় ছোটোখাটো উটের মতো এক ধরনের প্রাণী। অ.

pathagar.net

কোনো দায়িত্বভারই নষ্ট করতে পারে না তাঁর সোনালি শরীরের স্নিগ্ধতা। সুগোল সমর্থ গ্রীবা পর্যন্ত নেমে এসেছে উছলে-ওঠা ঢেউ-তোলা শাদা চুলের রাশি। শ্মশ্রুমণ্ডলে মুখের নিচের দিকটা আড়াল, আর তারই ফলে ওপরের অংশ হয়ে উঠছে আরো দীপ্যমান। মসৃণ ত্বকের অন্তরালে তাঁর সমগ্র মুখাবয়বের গড়ন এক অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য রচনা করেছে, তেমনি সুন্দর তাঁর কালো চোখ, নিখুঁত টানা ভারি পল্লব। শুভ্র কেশদাম আর স্নিগ্ধ শ্মশ্রু, এর বৈপরীত্যে জ্ব'লে উঠছে তাঁর চোখের সজীবতা। দীর্ঘ দেহ, শোভন চলন। তাঁর প্রকাশময় দুটি অতুলনীয় শুদ্ধ হাতের সুধীর সুষমা যেন অবাক ক'রে দেয়, মনে হয় যেন এদের নিজেদেরই কোনো ভাষা আছে। অনেকদিন পর যখন মৃণালিনী সরাভাইয়ের[২৬] নাচ দেখি, তখন জেনেছি যে সত্যিই ভারতীয় নৃত্যে হাতের মুদ্রা কথা বলে তার নিজের ভাষায়।[২৭]

কিন্তু যা ভেবেছিলাম, আমার হৃদয়ের এত কাছাকাছি এই মানুষটির সত্যি আবির্ভাবের সামনে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই উঠে পড়লাম আমি, বিদায় নিলাম। এইটুকু দেখা হবার স্বপ্ন কত যে দেখেছি তা জানত আমার বন্ধুটি, সে তাই খুব থতমত হয়ে গেল আমার এই ব্যবহারে।

দ্রুত দৌড়োলাম বাবা-মার কাছে। কিন্তু তাঁরা বললেন যে সান ইসিদ্রোর বাড়িটি ছেড়ে দেওয়া তাঁদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। তখন মনে হলো আরেক আত্মীয়জনের কথা, আমাদের বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে তাঁদের আস্তানা, বাড়ির নাম 'মিরালরিও'।[২৮] ইনি এক সপ্তাহের জন্য বাড়িটি দিতে রাজি হলেন। তবে রবীন্দ্রনাথকে আরো বেশিদিন থাকতে হয়েছিল এখানে, পুরো সময়ের জন্যই ওটা আমি ভাড়া ক'রে ফেলেছিলাম। আবার দৌড়ে

ফিরলাম হোটেলে। এল্‌ম্‌হার্স্টকে জানিয়ে দিলাম যে দুদিনের মধ্যেই কবিকে খুব-একটা নিরিবিলি জায়গায় সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা যাবে। জমিটা ছিল বিরাট, বাড়িও বেশ বড়ো। শাদা ঝক-ঝক করছে নতুন বাড়ি। এর তিনতলার অলিন্দ থেকে আর দোতলার হলঘর থেকে দেখা যায় নদী, আর সামনেই ডানদিকে ভরাট এক মেপ্‌ল্‌ গাছ। সুগন্ধ সুন্দর ফুলের সমারোহ, গোলাপ আর হথর্ন। আমার মনে হলো, অন্তত এই ফুলগুলি নিশ্চয় আমার অতিথির যোগ্য হবে।

অবশেষে এল সেই দিন। বারোই নভেম্বর।[২৯] রবীন্দ্রনাথ এসে পৌঁছলেন সান ইসিদ্রোতে। সেই প্রথম দেখাশোনার পর আর আমাদের দেখা হয়নি এখনো!

দুপুরে খাবার জন্য ডেকে নিয়ে গেলেন কয়েকজন গণ্যমান্য লোক, খ্যাত কোনো পর্যটক এলেই এঁরা নিয়মমতো আপ্যায়ন ক'রে থাকেন। এ-আসরেও আমি যাইনি।

বিকেল তিনটেয় গেলাম ওঁকে ফিরিয়ে আনতে। সমুদ্রবাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় কালাও স্ট্রিট তখন বিপর্যস্ত। গাছের নতুন পাতা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, পথের ধার থেকে উড়িয়ে আনছে শুকনো ধুলো আর ছেঁড়া কাগজের রাশি। আকাশ কোনোখানে হলুদ, কোথাও বা সীসার মতো ধূসর। পথচল্‌তি মানুষের পক্ষে এ যেন এক সতর্ক-বাণী : ঘরে ফেরো, ঘরে ফেরো। সান ইসিদ্রোর দিকে চলেছি আমরা, ধুলোর ঝড়ে ভ'রে গেছে গাড়ি। কিন্তু যখন এসে পৌঁছলাম সান ইসিদ্রোতে, সমস্ত দৃশ্য যেন পালটে গেল এই বাড়িটির সামনে, সব কেমন ঠাণ্ডা, ছিমছাম। মোমের গন্ধ, টাটকা ফুলের গন্ধ। বাইরের গাছে বাতাসের দাপাদাপি, তারই ফলে আরো ঘন হয়ে উঠছে ভিতরের নীরবতা। যেন শঙ্খের মধ্যে শুনছে কেউ সমুদ্রধ্বনি। সদর দরজা

বন্ধ হলো। ঘরের শ্বেত নির্জনতায় আমাদের ঘিরে ধরল গোলাপ আর সোনালি হথর্নগুচ্ছ।

সেই বিকেলে আকাশ ক্রমেই আরো হলুদ হয়ে আসছিল, আর বিশাল ঘন কালো মেঘ। এমন ভয়ংকর গুরু মেঘ, অথচ এমন তীব্র ভাস্বর—কখনো এমন দেখি নি। আকাশ কোথাও সীসার মতো ধূসর ; কোথাও মুক্তোর মতো, কোথাও-বা গন্ধকের মতো হলুদ, আর এতেই আরো তীব্র হয়ে উঠছে নদীতট আর তরুশ্রেণীর সবুজ আভা। ঊর্ধ্ব-আকাশে যা ঘটছিল, জলের মধ্যে তাই ফলিয়ে তুলছিল নদী। কবির ঘরের বারান্দা থেকে দেখছিলাম এই আকাশ, এই নদী, বসন্তের সাজে ভরা এই প্রান্তর। বালুচরের উইলো গাছগুলি খেলা করছিল ছোটো ছোটো হাজার নম্র পাতায়।

ঘরে ঢুকতেই ওঁকে নিয়ে এলাম অলিন্দে, বললাম : নদীটি দেখতেই হবে। সমস্ত প্রকৃতি যেন আমার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে দৃশ্যটাকে ক'রে তুলল পরম রমণীয়। আলোর পাড়ে বোনা প্রবল মেঘপুঞ্জের অন্তরালে কে যেন এক প্রতিফলক সাজিয়ে ধরেছে আকাশে।

এ-অলিন্দ হয়ে উঠবে তাঁর নিজেরই অলিন্দ। নভেম্বর-ডিসেম্বর দু'মাস জুড়ে ওইখানে দাঁড়িয়েই তিনি দেখবেন 'গোলাপি কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা বিকেলগুলি' (ঠিক যেমন আরো এক কবি দেখেছিলেন আরেক শীর্ণ নদী সেইনের কাছাকাছি এক বারান্দায়)।[৩০] এ-স্মৃতি গাঁথা ছিল তাঁর মনে, শান্তিনিকেতন থেকে লিখেছিলেন অনেক পরে : 'আমার শরীর এখনো সারে নি। দেহের এই ভগ্নদশায় থেকে-থেকে আমার মন চ'লে যায় সান ইসিদ্রোর সেই বারান্দাটিতে। স্পষ্ট এখনো মনে পড়ে সকালবেলার আলোয়-ভরা বিচিত্র লাল নীল ফুলের উৎসব। আর বিরাট সেই নদীর ওপর নিরন্তর রঙের খেলা, আমার নির্জন অলিন্দ থেকে অক্লান্ত সেই চেয়ে দেখা।'[৩১] বেশ সচেতন

ছিলাম রবীন্দ্রনাথকে এই একটি জিনিসই আমি দিতে পারি, নদীর দৃশ্যে সাজানো এই অলিন্দ। এই ছবিই তাঁর যোগ্য উপহার, জানতাম যে এটা তিনি ভুলবেন না কখনো।

প্রথমে ঠিক ছিল আটদিন, পরে ওঁকে এখানে থাকতে হলো কয়েক মাস। যদিও ওঁর ইনফ্লুয়েঞ্জাটা উদ্‌বেগেরই ব্যাপার ছিল, তবু এটা বললে মিথ্যে হবে যে ভিতরে-ভিতরে এ-অসুখটার জন্যে আমি খুশী হই নি। মিরালরিও-তে থাকতাম না আমি, ঘুমোতে যেতাম বাবা-মার কাছে। শুধু, রোজ দুপুরে আর রাত্রে খাবার আয়োজন করতাম ও-বাড়িতে কবির সঙ্গে। এছাড়া উপায়ও ছিল না, কেননা রাঁধুনী আর পরিচারকেরা[৩২] সবাই তখন আমার বাসন-পত্র নিয়ে মিরালরিও-তে চ'লে গেছে। আমার কেবলই মনে হতো, কী ভাগ্য ওই রাঁধুনীর, কী ভাগ্য পরিচারকদের! আমি চেয়েছিলাম উনি যেন যতটা সম্ভব নিজের বাড়িতে আছেন ব'লেই ভাবতে পারেন। তাই ভয় হতো যে সব সময়ে আমি ওখানে থাকলে হয়তো ওঁর অসুবিধেই হতে পারে। কখনো তাই দূরেই থাকতাম, যেতাম না ওঁকে দেখতে। ওঁর কাছে ভালো হবার জন্য নিজেকে আমি সরিয়ে নিতেও তৈরি ছিলাম।

কিন্তু এই যে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে তাঁর ওপর ভর করি নি সব সময়ে, এড়িয়ে গেছি কখনো-বা—এই আত্মত্যাগটা রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, সে ভারি মজার ব্যাপার, খানিকটা দুঃখেরও বটে। রানী চন্দের লেখা 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' বইতে লেখিকার সঙ্গে কবির অনেক কথোপকথন তুলে দেওয়া আছে। কবির মৃত্যুর পর ১৯৪২ সালে ইংরেজিতে এর অনুবাদ করেছিলেন ক্ষিতীশ রায়। এ-বইতে দেখতে পাচ্ছি ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ না-কি বলেছিলেন[৩৩] :

Pathagar.net

সেদিন বিজয়ার চিঠি পেলুম। ছোট্ট একটি কার্ডে লিখেছে 'যদি তুমি আমায় কিছু লেখো।' একবার আসতে লিখে দিলুম। আমার জন্যে যে কী করবে দিশে পেত না। নিজের বাড়িতে সবচাইতে সেরা সুখসুবিধের মাঝে আমাকে রেখেছিল। অজস্র টাকা আমার জন্যে খরচ করেছে, তাতেও যেন ওর তৃপ্তি নেই। সব সময় তবু আশায় থাকত আমি কী চাই। আমার চাওয়া ও প্রাণ দিয়েও মেটাবে, এমনি ভাব। ওদের সমাজে ওরা ছিল খুব অ্যারিস্টোক্র্যাটিক, অনেকটা পর্দার মাঝেই থাকত। ওঁদের সমান লোক ছাড়া কারো সঙ্গে আলাপ, মেলামেশা করত না। মাঝে মাঝে আমি কাউকে চা'য়ে ডাকতুম, বিজয়া কখনো ওদের সামনে আসত না। ভিতর থেকে যাতে কোনো অসুবিধে না হয়, সব দেখাশুনো করত, কিন্তু কখনো ওদের সঙ্গে আলাপ করত না। আমার তা কেমন যেন লাগত। একদিন এল্‌মহার্স্টকে বললুম, 'এটা কেমনতরো? লোকজন বাড়িতে আসে অথচ বিজয়া বের হয় না ওদের সামনে, ওরা ভাবে কী, যার বাড়িতে আসে সে-ই বের হয় না।'

ঠিক তার পরদিন দেখি বিজয়া এসে দিব্যি হেসে ওদের চা খাওয়াচ্ছে। এতে ক'রে হলো কী, বিজয়া যাদের সামনে বের হয়, তারা পড়ে সংকুচিত হয়ে। তারা যেন জড়োসড়ো হয়ে থাকে। বিজয়া আমার 'চাওয়া'র কাছে ওর সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করত।

বিজয়া খুব শিক্ষিতা মেয়ে ছিল। মাঝে মাঝে আসত, আমার সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ করত। প্রায়ই আমায় বলত, কেন তুমি স্প্যানিশ ভাষা জানলে না, আমি যে সব কথা তোমাকে ইংরেজিতে বোঝাতে পারি নে।[৩৪] আমারও দুঃখ হতো খুব, কেন স্প্যানিশ ভাষা শিখি নি কোনোদিন।...

pathagar.net

মেয়েদের একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে তাদের ভিতরকার জিনিস—ইমোশন। এ যখন একটা ক্যারেক্টারের সঙ্গে মিলে রূপ নেয়, তা অতি আশ্চর্য। এর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন নিবেদিতা। তিনি সত্যিকারের পুজো করতেন বিবেকানন্দকে।[৩৫] তাই তিনি অনায়াসে গ্রহণ করলেন তাঁর ধর্মকে। নিজের দেশ আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে এলেন এই দেশে। এই দেশকে, এই দেশের লোককে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। তাঁর এই ভালোবাসা যে কত সত্যিকারের তা বলবার নয়। সব কিছু ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁর এই সাহস, এই আত্মত্যাগ অবাক ক'রে দিয়েছিল আমাকে। আমি নিবেদিতার কাছে প্রায়ই যেতুম।...

মেয়েদের যেটা ইমোশন সেটা যদি শুধু ইমোশনই হয় তবে তা অতি সহজেই বিকৃত হয়, কিন্তু তার মধ্যে যদি একটা ক্যারেক্টার থাকে তবেই হয় তার সত্য প্রতিষ্ঠা।

বিদেশে দেখেছি, তারা যখন ভালোবাসে তখন তার ইমোশনকে একটা রূপ দেয়; একটা কাজের ভিতর দিয়ে তার প্রতিষ্ঠা করে। আমি পেয়েছি বিদেশেও এই শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালোবাসা। সেই স্প্যানিশ মেয়ে বিজয়া, প্রথমেই আমায় বললে যে, আমি তোমার জন্যে কী করতে পারি। আমি যখন ওখান থেকে এলুম তখন সে করলে কী—খুব দামী ইটালিয়ান জাহাজে দু-দুটো ক্যাবিন ঠিক করলে আমার জন্যে। আমি বললুম, এর প্রয়োজন কী। কিন্তু সে কিছুতেই মানবে না, বললে একটাতে তুমি দিনের বেলা কাজ করবে আর একটা ক্যাবিনে রাত্রে শোবে। এর কারণ আর কিছুই নয়, আমার জন্য কিছু করতে চায়, এই ছিল তার আকাঙ্ক্ষা। একটা সোফা সেটা

pathagar.net

কিছুতেই ঢোকে না ক্যাবিনের দরজা দিয়ে। কাপ্তেনকে ব'লে দরজা কাটিয়ে বড়ো ক'রে তবে সেই সোফাকে ক্যাবিনে ঢোকালে। ব'সে বিশ্রাম করব তাতে।

তারপর দ্বিতীয়বার যখন আবার যাই বিদেশে তখন সেও ইওরোপে ছিল। সঙ্গে ছিল সেবার আঁকা ছবিগুলো। সে বললো, আমি এগুলো এ-দেশে বড়ো বড়ো ক্রিটিকদের দেখাব। সে দেদার টাকা খরচ ক'রে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করলে; তাও কত খরচ ক'রে।

তাই দেখেছি যে বিদেশি মেয়েরা তাদের ভালোবাসার প্রতিষ্ঠা করে কাজের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে। একরকম ভালোবাসা আছে যা তুলে ধরে, বড়ো করে। আর একরকম ভালোবাসা আছে—আমাদের দেশে, যেটা মারে, চাপা দিয়ে দেয়।

আমার মনে হয়, মেয়েদের কাছ থেকে আমরা যেটা পেতে পারতুম তার অনেকখানি অপব্যয় হয় কেবলমাত্র তার চোখের জলের সীমানার মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীরা যখন তাঁর সঙ্গে চা খেতে আসতেন, আমি সত্যিই নিজেকে একেবারে সরিয়ে নিতাম। কেননা আমার ধারণা ছিল এতে হয়তো ওঁরা খানিকটা খোলামেলা বোধ করবেন। কিন্তু এল্‌ম্‌হার্স্ট একদিন যখন বললেন যে রবীন্দ্রনাথ আমার এই না-থাকাটায় খুব বিস্মিত হন, তখন নিজেকে পালটে নিলাম। সত্যি বলতে, শ্রেণী-অভিমান আমার কখনোই ছিল না, জাতের গর্বও নয়। ফলে এ-রকম যে কেউ ভাবতে পারেন তা আমার মনেই হয়নি কখনো। যা হোক, এই তো হলো ব্যাপার। ওঁদের পরিবারটি

pathagar.net

এ-ধরনের সংস্কারের বিরোধী হলেও যে-দেশ থেকে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ তা তো আজও বর্ণবিভাজিত, তাই আমার বিষয়ে ওঁর এই ভাবনাটা ভুল হলেও একেবারে অপ্রত্যাশিত হয়তো নয়।

বস্তুত যতটা সময় গুরুদেবের সান্নিধ্য থেকে দূরে কাটাতে হতো তার সবটাই আমার মনে হতো নষ্ট, নিরর্থক। যেন একটা লটারি জিতবার পরেও সঙ্গে কেবল টিকিটটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ছুঁতে পারছি না টাকাটা। মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগলাম আমার এসব বিচারবিবেচনাকে।

একদিকে দুর্ভাবনা অন্য দিকে ঔৎসুক্য, একদিকে এই সান্নিধ্যের একটা টুকরো থেকেও বঞ্চিত না হবার আকূতি আর অন্য দিকে আমার ভীরুতা, এই দ্বন্দ্বে আমি ছিঁড়ে যাচ্ছি। অগত্যা সেই রাঁধুনী আর পরিচারকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলাটাই হলো আমার সান্ত্বনা। ওরা যে আমার চেয়ে বেশি ক'রে পাচ্ছে আমার অতিথির সামীপ্য, এই সুযোগটায় ওদের অবশ্য ভারি মজা লাগছিল।

অল্পে অল্পে বুঝে নিলাম মানুষ রবীন্দ্রনাথকে, ধরতে পারলাম ওঁর চালচলন। অল্পে অল্পে রবীন্দ্রনাথও বশ ক'রে নিলেন একাধারে বন্য আর নিরীহ এই নবীন প্রাণীটিকে। রাত্রিবেলায় যে-কোনো গৃহপালিতের মতো[৩৬] তাঁর দরজার বাইরে মেঝের টালির ওপর যে শুয়ে থাকতাম না, তার একমাত্র কারণ এই যে ব্যাপারটা খুব ভালো দেখায় না!

pathagar.net

নিঃসঙ্গ পুরুষ[১]

There are some who have sat speechless for ages in thy shadow ; let me utter their song.[২]

Rabindranath

I dive down into the depth of the ocean of forms, hoping to gain the perfect pearl of formless.[৩]

Rabindranath

রবীন্দ্রনাথ ঠিক করেছিলেন যে সান ইসিদ্রো ছেড়ে তিনি যাবেন না। তবে, কেবল এক সপ্তাহের জন্য তিনি ছিলেন 'মার দেল প্লাতা'য়, চাপাদমালালে। এটি ছিল মার্তিনেজ দ্য হোজ্-এর এস্টেট। পরম অতিথিপরায়ণ এই ব্যক্তি বাড়িটি ছেড়ে দিয়েছিলেন আমাকে।

সেই দূর নভেম্বরের একটি কাগজে দেখছি রবীন্দ্রনাথকে বলা হচ্ছিল 'পুন্তা চিকার নিঃসঙ্গ পুরুষ'।[১]

তেইশে নভেম্বরে La Nacion পত্রিকায় ছাপা হলো রাশিয়ার প্রতি কবির এই বাণী[৪] : 'মানুষের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায় পথটাকে অনেকে একটু ছোটো ক'রে নেবার স্বপ্ন দেখেন, শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা। মানবজাতির জন্য এঁরা কেবল রেখে যান সমাপ্তিহীন হিংসার পরম্পরা। গৃহকে আলোকিত করবার দ্রুততম উপায় নিশ্চয় ঘরে আগুন লাগানো। কিন্তু এর সফলতা তো কেবল এই যে এ আমাদের এনে দেয় আলোকের ঝটিতি অবসান, বিনিময়ে আমাদের হাতে মেলে এক মহা-অন্ধকার।'

এদেশে পৌঁছবার পর সাংবাদিকদের কাছে যদিও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'আমি শিক্ষাব্রতী, কবি, আমি রাজনীতিক নই', যদিও বছর

pathagar.net

তিনেক আগে খানিকটা জোর দিয়েই তিনি বলেছিলেন যে তাঁর আর গান্ধীর পথ এক নয়, কিন্তু তবু দেখেছি ভারতবর্ষের বা গোটা পৃথিবীর রাজনৈতিক আন্দোলন ওঁকে ভ'রে রাখত নিরন্তর উৎকণ্ঠায়।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়ে আমি তখন ছিলাম নিতান্ত অজ্ঞ, এখনো তাই। কত এর উত্থান পতন, এর নিদারুণ চক্রান্ত ভ্রান্তি আচম্‌কা বাঁক, এর 'অয়মহম্ ভোঃ' ধরন, ন্যায্য ঘৃণার ছলে কত না চতুরতা নির্লজ্জতা আর জাতীয় আত্মম্ভরিতা, দেশপ্রেমের ছদ্মবেশে কতই লুব্ধতা! রাজনীতিকদের বাগাড়ম্বর শুনে শুনে একেবারে অবসন্ন লাগে। মিথ্যে সব সময়েই ক্লান্তিজনক, অথচ অনেকে আছেন যাঁরা বলেন যে মিথ্যে যত বড়ো হবে ততই সহজে তা বিশ্বাস করবে সাধারণ লোক।

এসব সত্ত্বেও ভারতবর্ষে কী ঘটছে তার হালফিল খবর আমার জানা ছিল। তখন আমি গান্ধীকে আবিষ্কার করেছি; তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার ফলে তাঁর দেশের সমস্যাবলি বুঝবার চেষ্টা করছি। কিন্তু এ নিয়ে কিছু বলবার সাহস হতো না রবীন্দ্রনাথের সামনে। হয়তো তাঁকে আঘাত ক'রে বসব, হয়তো-বা বোকার মতোই ব'লে বসব কিছু। তাছাড়া, তাঁর দেশের ব্যাপক আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ফলে এমনিতেই ব্যথাকাতর হয়ে আছে তাঁর মন, আমার কী প্রয়োজন সে-প্রসঙ্গ তুলে বা নানা প্রশ্ন ক'রে আরো তাঁর বিষাদ ডেকে আনা? যদিও এটা ঠিক যে আমার জিজ্ঞাসা নিছক কৌতূহলজাত নয়, আমার ঔৎসুক্যে ছিল সত্যিকারের আবেগ। কিন্তু আমি ছিঁচকে সাংবাদিকদের মতো নই যে বড়ো কোনো লেখক বা গাইয়েকে নিজের বাড়িতে পাওয়া গেছে ব'লেই সে-সুযোগটাকে অন্যদের মতো ব্যবহার করতে থাকব, লেবু নিংড়ে নিংড়ে পাঠকদের সামনে পরিবেশন করব বিস্বাদ লেমনেড।

pathagar.net

১৯২৪ সালের মে মাসে রোম্যাঁ রলাঁও ভয় পাচ্ছিলেন যে এই ক্ষইয়ে-দেওয়া পর্যটনে কবির শরীরের উপর চাপ পড়বে খুব। ডায়ারিতে[৬] লিখছেন তিনি : 'এই কয়েক বছরের উদ্‌বেগে একেবারে ভেঙে পড়েছে গুরুদেবের স্বাস্থ্য। দেখা দিচ্ছে অনিদ্রার উপসর্গ। আমি তো মনে করি একেবারে নিঃশেষ হয়ে আসছেন তিনি। তাঁর জীবনযাপন যাঁরা লক্ষ করেছেন তাঁদের অবিশ্যি এতে আশ্চর্য হবার কথা নয়। শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের সময় প্রায় সবটাই দখল ক'রে রাখে অভ্যাগতের দল। কখনো দেখা দেয় মার্কিন পরিব্রাজকেরা, কবিকে এরা অন্যতম দ্রষ্টব্য বিষয় ব'লে ঠাউরে নিয়েছে; কখনো কলকাতা বা অন্যান্য অঞ্চলের সম্পন্ন মানুষেরা আশ্রমে আসেন অবসর যাপনে, আর ভারতীয় প্রথায় থেকে-থেকে হাজির হন কবিসন্দর্শনে। সকাল ছটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন চলছে এই শোভাযাত্রা।'

বেশ চোখেই পড়ছিল এই ক্ষয়। দেশ থেকে বা বিলেত থেকে পাওয়া চিঠিপত্র সহসা পালটে দিত ওঁর মেজাজ, যেন একটা ছায়া ফেলে যেত। অল্পে অল্পে এর লক্ষণ আমি বুঝে নিতে শিখছিলাম। এসব সময়ে গোটা বাড়িটার এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতাম যেন পুর্গাতোরিয়োর কোনো প্রেতের মতো, সাহস হতো না যে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করি : 'কী হয়েছে?'

তাঁর প্রীতিভাজন ইংরেজ সখা সি. এফ. অ্যাণ্ডরুজের কাছে রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন 'কবির দেখাশোনা করবার দায়িত্ব কী ভয়াবহ!'[৭] এই ভয়ের অভিজ্ঞতা আমার খানিকটা ঘটেছিল বটে! মাঝে মাঝেই উনি ব্যবহার করতেন শিশুর মতো, কবিরা যেন শৈশবের কোনো কোনো লক্ষণ পুরোই বাঁচিয়ে রাখেন তাঁদের আচরণে। মহাপুরুষদের মহিমার একটা দিক কিন্তু তাঁদের এই শিশুসুলভ ধরন, অন্য

সবার মতো তো নন তাঁরা। যদি কেবলই ছিমছাম, বিজ্ঞ বা প্রমাদ-হীন হতেন তাঁরা, তাহলে তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা করতাম আরো বেশি, কিন্তু ভালোবাসতাম কম। ফরাসি লেখকেরা যেমন বলেন, পূর্ণতা হলো নির্জীবতা![৮]

গান্ধীর সঙ্গে কথা বলবার কোনো সুযোগ আমার হয়নি। লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরতি পথে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে পারীতে ওঁকে দেখেছিলাম অবশ্য, কথা বলতেও শুনেছিলাম। একমাত্র তাঁরই মধ্যে দেখেছিলাম অন্তরতর পূর্ণতা, একমাত্র তাঁরই ছিল কথায় আর কাজে এক সন্তসুলভ সুসংগতি, কিন্তু তাহলেও তাঁর আবির্ভাব আতুর ক'রে ধরে নি আমাকে। তাঁর মহিমা ছিল অনায়াস, ভারহীন! চারপাশে এমন এক পরিমণ্ডল গ'ড়ে তুলতেন তিনি যে তাঁর পার্শ্বচরেরা ভ'রে উঠত আনন্দে আর প্রত্যয়ে। 'প্রলেপ' : এই হচ্ছে ঠিক যোগ্য শব্দ। হয়তো তাঁরও মধ্যে কোথাও কোথাও ছিল মানুষের যোগ্য অসম্পূর্ণতা, কিংবা হয়তো সন্তদের পূর্ণতার ধরনই এই, তা দূরে ঠেলে দেয় না!

পুরোনো-সব পত্রিকা খুঁজে দেখছিলাম কবির স্বাস্থ্য বিষয়ে সেখানে কী মন্তব্য করা হয়েছে। ডাক্তারেরা নির্দেশ দিয়েছেন, শ্রম-সাধ্য কিছুই যেন না করেন তিনি। পুরোপুরি সেরে না ওঠা পর্যন্ত একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকতে হবে তাঁকে। এটা কেবল আমাদের ডাক্তারেরাই বলেছেন তা নয়, ফিরে যাবার পর দেশ থেকে উনি লিখেছেন আমাকে : 'কোনো কোনো প্রাণী আছে যারা মারাত্মক বিপদ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য মৃত্যুর ভান করে। চিকিৎসকেরা আমাকে তাদের দৃষ্টান্তে চলতে বলছেন। তাঁদের আদেশ এই যে আমি চলাফেরা করব না, কথা বলব না, অতিথিআপ্যায়ন করব না। এক কথায়, আমাকে এমনভাবে চলতে হবে যেন আমি মরেই

গেছি!'[৯] কথাগুলি ওঁর স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গপ্রিয়তার উদাহরণ। কিন্তু সান ইসিদ্রোতে এল্‌ম্‌হার্স্ট আর আমি যখন ওঁকে ডাক্তারি বিধিমতে বশ করবার চেষ্টা করছিলাম তখন ছিল আরেক রকম সুর, স্পষ্টতই উনি তখন বিরক্ত হচ্ছিলেন। খুবই শক্ত হচ্ছিল একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছনো। হয় তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে অভ্যাগতদের সরিয়ে রেখেছি ব'লে শুনতে হতো ওঁর ভৎর্সনা, আর নইলে দলেদঙ্গলে যে ভক্তেরা আসতেন তাঁদের সঙ্গে কথা ব'লে নিঃশেষ হতে হতো ওঁকে। ওঁকে অখুশী করব, দিনরাত এই ভয়ে মরছি। কখনো হয়তো বিদ্রোহ ক'রেও বসতাম, হয়ে উঠতাম অধীর, আপনমনে বলতাম 'কী বিপদ! প্রাচ্যেই বলো আর প্রতীচ্যেই বলো, লোকে যদি নিজের দায়িত্ব নিজে না নিতে পারে বা নিতে চায় তাহলে তো তাকে মরতে হবে—এমন-কী, তিনি যদি কবিও হন! বেশ কথা, উনি যদি নিজেকে সামলে না চলেন তো অগত্যা আমাকেই সব দেখতে হবে, সেটা ওঁর পছন্দ হোক বা না-ই হোক!'

তবু ওঁকে ক্ষুণ্ণ করবার ভয় প্রায়ই শমিত রাখত আমাকে। তাই, সান ইসিদ্রোতে আমার সন্তর্পণ দেখাশোনায় কিছুদিন কাটিয়ে যাবার পর যে চিঠি লিখেছিলেন আমাকে, সে ছিল মস্ত এক সান্ত্বনার মতো। সেই চিঠি থেকে খানিকটা বলি এখানে: 'লোকে যাকে আতিথেয়তা ব'লে থাকে তার জন্য কাল রাত্রে তোমাকে যখন ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম, আশা করি বুঝতে পেরেছ যে তখন আমার সত্যিকারের ভাবনার তুলনায় খুব সামান্যই বলতে পেরেছি। কী দুঃসহ নিঃসঙ্গতার ভার আমাকে বইতে হয়, তোমার পক্ষে তা ধারণা করা শক্ত হবে। বিশেষত আমার অভাবনীয় আকস্মিক খ্যাতির ফলে সমস্ত জীবনের মতো চেপে বসেছে এই ভার। আমি যেন এক অভাগা দেশ, কোনো অশুভ দিনে সেখানে এক কয়লাখনির আবিষ্কার হয়েছে। ফলে এর

ফুলগাছগুলির আর দেখাশোনা হয় না, উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে এর বন-ভূমি, যেন এ নগ্ন প'ড়ে আছে অগণ্য ভাগ্যান্বেষীর লুব্ধ দৃষ্টির সামনে। আমার বাজারদর গেছে বেড়ে, আর আচ্ছাদিত হয়ে গেছে আমার ব্যক্তিগত মূল্য। দিনরাত এক আর্ত উৎকণ্ঠায় সে-মূল্য ফিরে পাবার সাধনা করছি আমি। আজ আমার মনে হলো তোমারই কাছে আমি পেয়েছি সেই অমূল্য আশীর্বাদ। মনে হলো, আমার কী আছে তার বিচারে নয়, আমি সত্যিই যা, ঠিক সেইভাবেই তুমি বুঝতে পারো আমায়।'[১০]

খুশিতে আহ্লাদে ভ'রে উঠলাম চিঠি পেয়ে।

মিরালরিওতে থাকবার সময়ে সকালের দিকে রবীন্দ্রনাথ লিখতেন, নিজের বাগানে বেড়াতেন, নয়তো আমার বাগানে চ'লে আসতেন। ওঁর অলিন্দ থেকে ধ্যানমগ্ন তন্ময়তায় দেখতেন ফুল বা পাখি। পড়তেন হাডসনের[১১] লেখা। বিকেলের দিকে শুরু হতো অভ্যাগতের স্রোত। প্রায়ই নদীর ধারে এক উইলো গাছের নিচে গিয়ে বসতেন আর অতিথিরা তাঁকে ঘিরে বসতেন অর্ধবৃত্তে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন ইংরেজিতে। দরকার হতো অনুবাদ করবার। সে-কাজটা সচরাচর করতেন শ্রীযুক্ত বারোস, আর কখনো-বা আমি। কখনো-কখনো কোনো অপ্রত্যাশিত অতিথির দেখা মিলত, আসতেন থিওসফিতে উৎসাহী অনেকে। একদিন সকালে এল এক তরুণী (দিনের পর দিন যেসব লোকজন আসতেন তাঁদের খুব কমই চিনতাম আমি), এসেই জোর করতে লাগল যে এক্ষুনি তাকে দেখা করতে দেওয়া হোক। কবিকে বাঁচাবার জন্যে আমরা যে সতর্ক প্রহরা তৈরি করে-ছিলাম তা নিয়ে একটু ঠাট্টা ক'রে উনি তো ঐ ভোরবেলায় ডেকে নিলেন মেয়েটিকে। পরে শুনলাম, মেয়েটি কাল রাত্রে যে স্বপ্ন দেখেছে তার মানে ব'লে দেবার জন্য ধরেছিল ওঁকে। স্বপ্ন দেখেছিল

হাতির। ভারতবর্ষে হাতি-টাতি পাওয়া যায়, তাই এই হাতির স্বপ্নের মানে তো রবীন্দ্রনাথের বলতে পারাই উচিত! এল্‌ম্‌হার্স্ট আর আমার মধ্যে চকিতে দৃষ্টিবিনিময় হলো: আমাদের রোগীটিকে কোনোরকমে সামলে নেবার এই হচ্ছে সময়। একবার যদি এরা ওঁকে আর পাঁচজন গণৎকারের মতো ঠাউরে নেয় তাহলে আর এ-বাড়িতে এক মুহূর্তের শান্তি মিলবে না। পাগলামি একেবারে! ভারতবর্ষে তো গোরু বানর সাপ পাখি কত কিছুই পাওয়া যায়। অন্য কোনো মহিলা তো অন্য কোনো জন্তুর স্বপ্ন দেখতে পারেন—কেনই-বা দেখবেন না—আর অম্‌নি তাঁরা সকালবেলায় সে-স্বপ্নের মানে বুঝবার জন্যে যদি হাজির হন মিরালরিওতে, এই হাতির মেয়েটির মতো?

সত্যি বলতে, দর্শনার্থী এইসব উমেদারদের জন্য আমি একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু কবির ভালোমানুষির আর সীমা নেই। ওঁকে ভোলানোর চেষ্টায় বৃথাই আমরা সময় নষ্ট করতাম। ওঁর ধরনধারণ উনি পালটাবেন না।

ভারতবর্ষ বিষয়ে রোমঁ্যা রলাঁর বইটি[১২] সম্প্রতি নূতন ক'রে পড়ছিলাম। আর্জেন্টিনায় রবীন্দ্রনাথের থাকাকালীন যেসব ভাবনার প্রতিফলন এখানে দেখছি তার সঙ্গে আমাদের ধারণা অবশ্য মেলে না। রবীন্দ্রনাথ আর এল্‌ম্‌হার্স্ট সে-সময়ে এখানে যা-সব দেখেছেন ব'লে ভাবছিলেন, তার থেকে ওঁদের নিজেদেরই মতো একটা ধারণা গ'ড়ে নিয়েছিলেন, জার্মানরা যাকে বলে 'আত্মগত'। বাস্তবের সঙ্গে তার অল্পই যোগ। দু'একটি উদাহরণ দেবার চেষ্টা করা যাক।

রলাঁকে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ: 'দক্ষিণ আমেরিকার দিকে তাকালে স্বস্তি পাই না। লোকে ওখানে হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছে, নিজেদের

আত্মাকে আবিষ্কার ক'রে নেবার কোনো সময় ওরা পায় নি। ওরা তৈরি-করা ভাবনাচিন্তা চায়, ভাবনা-জগতের জন্য ইওরোপের কাছে ওদের একান্ত আনুগত্য দেখে দুঃখ হয়। যে-কোনো স্টাইল অনুকরণ করতে পেলে স্পষ্টতই ওরা গর্বিত হয়ে ওঠে, ইওরোপ থেকে আমদানি করা সংস্কৃতির জন্যেও ওদের ভারি গর্ব।'[১৩]

কিন্তু আর কোথা থেকে আমাদের সংস্কৃতি আনব আমরা? যে-দেশ থেকে এসেছি, যে-দেশের আমরা সন্তান আর উত্তরাধিকারী, তার থেকে নেব না? ইওরোপীয় সংস্কৃতি কি আমাদের নিজেদেরই নয়?[১৪] আমরা কি কেচুয়া বা গুয়ারানি বা কোমেচিন্‌গন ইণ্ডিয়ানদের সংস্কৃতির মধ্যে আবদ্ধ রাখব নিজেদের? ইওরোপীয় সভ্যতার এই মার্কিন উত্তরাধিকার কী সম্পদ দিতে পারবে, তার বিচার করবে ভবিষ্যৎ কাল। কিন্তু উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত গোটা আমেরিকা নিজেকে অস্বীকার করতে না চাইলে ইওরোপকে অস্বীকার করতে পারে না। ভারতবর্ষ বা ইংল্যাণ্ডের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

আসলে হয়েছিল কী, ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ বা এল্‌ম্‌হার্স্টের মতো পর্যটকেরা লাতিন আমেরিকা আর এর স্পেনীয় উৎস আর গড়ন বিষয়ে অল্পই তথ্য জানতেন, খুবই অস্পষ্ট জানতেন। বোঝা কঠিন নয় যে তাঁরা যা শুনেছেন বা দেখেছেন তার তাৎপর্য ঠিক ধরতে পারেন নি। উত্তর আমেরিকাও রবীন্দ্রনাথকে উত্তেজিত করেছিল, কিন্তু তাঁদের পক্ষে উত্তর আমেরিকাকে চিনে নেবার চেয়ে আরো বেশি কঠিন ছিল আর্জেন্টিনাকে ধরতে পারা।[১৫]

এদেশের নির্ভরযোগ্য প্রতিভূদের সঙ্গে কবিকে মিশবার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলাম অনেক। যেমন ধরুন, রিকার্ডো গ্যিরাল্‌ডেস।[১৬] অবশ্য এঁর খ্যাত উপন্যাসটি তখনো বেরোয় নি, অর্থাৎ ওঁর এখনকার বিপুল প্রতিপত্তি তখন ছিল না। 'ফাকুলতাদ দ্য ফিলসফিয়া ই

pathagar.net

লেত্রাস্'-এও[১৭] একবার কবি যেতে পেরেছিলেন। তবে আর্জেন্টিনাকে বেশ ভালোভাবে জানবার পক্ষে তখন ওঁর শরীরই ছিল বাধা।

একদিন রাত্রে ওঁর ঘরের সামনে অলিন্দে ব'সে কথা বলছি, আমার অতিথিটির ইচ্ছে হলো আধুনিক ইওরোপীয় সংগীত শুনবেন। অমনি ফোন ক'রে ডেকে পাঠালাম হুআন হোসে আর মারিয়া কাস্ত্রোকে,[১৮] এঁরা তখন একটা কোয়ার্টেট গ'ড়ে তুলেছিলেন। বেহালা চেলো ইত্যাদি নিয়ে পুরো দলটি তো চ'লে এল। দেশ থেকে একটি চিঠি পেয়ে সে-রাত্রে কবি ছিলেন একটু মনমরা। হলঘরের মাঝখানে শিল্পীরা তাঁদের সাজসরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু আমার অতিথি রইলেন তাঁর শোবার ঘরে, দরজাটা ঈষৎ খোলা। হলের সংলগ্ন এক গ্যালারি থেকে উঠে গিয়েছে তাঁর ঘর। আমি আর কী করব, শিল্পী বন্ধুদের কেবল আঙুল তুলে বুঝিয়ে দিলাম রবীন্দ্রনাথ কোথায় আছেন; 'উনি ওই ঘরে, দয়া ক'রে ওঁকে মার্জনা কোরো, ওঁর শরীর ভালো নেই।'

'জীবনস্মৃতি'তে একটা পুরোনো কাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন[১৯] রবীন্দ্রনাথ, সেটা মনে প'ড়ে গেল আমার, নিজে নিজেই একটু হেসে নিলাম। ছাত্রবয়সে উনি যখন লণ্ডনে, ইংরেজ এক সম্ভ্রান্ত মহিলা ওঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর বাড়িতে। মহিলাটির এক বান্ধবী ছিলেন ভারতবর্ষের একজন বড়ো ইংরেজ কর্মচারীর বিধবা স্ত্রী। সেই ভদ্রলোকের স্মৃতিতে রচিত একটি বিলাপসংগীত গাইবার জন্য ডাকা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। যে গাড়িতে উনি পৌঁছলেন ওখানে, সেটা এতই দেরি করল যে খাওয়াদাওয়ার সময় তখন পেরিয়ে গেছে। লেমনেড বা ঐ জাতীয় কিছু একটা খেয়ে নিয়ে সারাদিনের উপোসী ক্ষুৎকাতর ছেলেটিকে রাত কাটাতে হলো এক সরাইখানায়। শীতের মাঝামাঝি সময়, কাঁপতে কাঁপতে হাজির হতে হলো মহিলাটির

নিবাসে। সেখানে সবাই মিলে তাকে নিয়ে গেল সিঁড়ির শেষ ধাপে, সামনে বন্ধ দরজা। ভিতরে মহিলাটি প্রস্তুত। আঙুল দিয়ে দরজাটি দেখিয়ে বলা হলো : 'ওই ঘরে উনি আছেন, গাও।'

তবে কি না, আমার শিল্পী বন্ধুদের সিঁড়ির চূড়োয় উঠে গাইতে হয় নি, বন্ধ দরজার সামনেও নয়। দেবুসি, রাভেল আর বোরোডিন[২০] খোলা-দরজার পথ দিয়েই পৌঁছতে পারছিলেন কবির ঘরে। এ-ব্যাপারটা নিয়ে অনেক সময়েই ওঁকে ঠাট্টা করবার লোভ হতো, বলতে ইচ্ছে হতো যে তরুণ ভারতীয় ছাত্রটি না বুঝেসুঝে বেশ ভালোই প্রতিশোধ নিয়ে নিলেন!

ফরাসি সংগীতকার দুজনের চেয়ে রুশ বোরোডিন বরং রবীন্দ্রনাথের কাছে কম দুর্বোধ্য এবং কম জটিল মনে হয়েছিল। মনে পড়ছে, উনি লিখেছিলেন : 'আমার এই কথা মনে হয় যে য়ুরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন ; ঠিক এক দরজা দিয়া হৃদয়ের একই মহলে যেন তাহারা প্রবেশ করে না।'[২১]

আমাদের পশ্চিমি সংগীত ওঁর কাছে যতটা জড়ানো আর বিন্যাস-বিহীন লেগেছিল, প্রথমবার ওঁর মুখে বাঙলা গান শুনে আমারও মনে হয়েছিল ঠিক ততটাই অসহ্য একঘেয়ে। এর থেকে বোঝা যাবে যে যতটা ভাবা যায় সংগীতের ভাষা ঠিক ততটা সর্বজনীন নয়। পরে কিন্তু আমি বাঙলা গানের বেশ ভক্তই হয়ে পড়ি।

দেবুসি বা রাভেল বা বোরোডিন—এঁরা কেউই অবশ্য আর্জেন্টিনার সংগীতশিল্পী নন। এ সবই নেহাৎ আমদানি করা গীতিপণ্য। কিন্তু আর্জেন্টিনাতে প্রস্তুত এর সমতুল্য কী আর আমি শোনাতে পারতাম? কিছুই না। স্থানীয় লোকগীতি? রিকার্ডোকে ধরা হলো তাঁর গিটার সুদ্ধ। বলা যায়, এইবার রবীন্দ্রনাথকে পরিবেশন করা গেল শতকরা একশো ভাগই জাতীয় খাবার।

pathagar.net

প্রথম দিকে কবি অনুযোগ করছিলেন শীতের বিষয়ে, আর ডিসেম্বরেই উত্ত্যক্ত হয়ে উঠলেন গরমে। আমার এক বন্ধু-পরিবারকে তাই জিজ্ঞেস ক'রে পাঠালাম তাঁদের সঙ্গে চাপাদমালালে কিছুদিন কাটিয়ে আসতে পারি কি না! তাহলে খুব সুন্দর একটা অঞ্চল দেখবারও সুযোগ ঘটবে ওঁর। অনুমতি মিলল, রওনা হলাম ট্রেনে, সঙ্গে আমার দুই অতিথি, আর বন্ধু আদেলিয়া আজেভেদো। আটলান্টিক থেকে মাত্র বিশ কিলোমিটার দূরের এই জায়গাটি সত্যি মনোরম।

এ-পরিবারে সকলেই লেখাপড়া করেছেন বিলেতে। বাড়িটি তাই ইংরেজদের ধরনে সাজানো, একেবারে সরাসরি ও-দেশি পুরোনো ধাঁচের আসবাবপত্রে। এমন-কী বাড়িটি বানানোও হয়েছে ইংরেজ স্থপতিকে দিয়ে, সব মিলে একটা ব্রিটিশ গন্ধ। এতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের একটু মোহভঙ্গই হলো। কেননা উনি খুব আশা করেছিলেন যে সত্যিকারের একটা গ্রামীণ দেশি আস্তানা দেখতে পাবেন।[২২] বললেন: 'ভিক্টোরিয়া, এ-বাড়িটা একেবারে বাজে জিনিসপত্রে ঠাসা।' বিদেশি হিসেবে একেবারে একটা গ্রামীণতা আশা করেছিলেন ব'লেই এ-রকম ধারণা ওঁর হয়েছিল, কিন্তু ধারণাটা সংগত নয়। গর্ব করবার মতো আর্জেন্টিনীয় আসবাবই বা কী আছে আমাদের! আছে কেবল মেহগনি আর আবলুশ কাঠের কিছু জিনিসপত্র, সেসব এতই কদর্য যে কেবল ফিগারির[২৩] ছবিতেই তাকে রোম্যান্টিক লাবণ্যময় ব'লে ভাবা যায়। এদের বিষয়ে একটি মাত্র ভালো কথা এই শুধু বলা যায় যে এ হলো আকর্ষণহীন ধীমতী মহিলাদের মতো, বয়েস হলে তবে তার চরিত্র আসে।

বেশ বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ এ-দেশের নিজস্ব অবয়বটি খুঁজে পাবার চেষ্টায় বেশ হতাশ হচ্ছিলেন। হাডসনের বইতে ('অনেক দূরে, অনেক আগে')[২৪] যে আর্জেন্টিনার বর্ণনা, ১৯২৪ সালে তার

pathagar.net

আর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এই ইংরেজটি ছিলেন আমাদের দেশ বিষয়ে একেবারে মুগ্ধ, আর রবীন্দ্রনাথও আর্জেন্টিনাকে জেনেছিলেন কেবল তাঁর লেখা ওই চমৎকার দলিল থেকে। কিন্তু কবির শ্রদ্ধাভাজন এই ইংরেজ যে-দিনগুলির কথা লিখেছিলেন, তা মিলিয়ে গেছে দ্রুত। যে নবীন দেশ বেড়ে উঠছে, কেবলই পালটাচ্ছে—কখনো-বা বৈপ্লবিক ভাবে—এইটেই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

কোনো মানুষের বা কোনো দেশের ক্রমজায়মান চারিত্রটি বুঝে নেওয়া কারো পক্ষেই বড়ো সহজ নয়; আর জাতিতে ধর্মে আচারে সংস্কারে যিনি আমাদের অনেক দূরবর্তী, তাঁর পক্ষে তো এ-কাজ আরোই বেশি কঠিন। জাহাজ থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন আমাকে: 'আমার তো পর্যটকের স্বভাব নয়। নূতন একটা দেশকে বুঝে নেবার মতো উদ্যম বা সামর্থ্য কোনোটাই আমার নেই।'[২৫]

কোনোই কারণ নেই, তবু ১৯২৫ সালে রোম্যাঁ রলাঁকে লেখা ওঁর চিঠিটি[২৬] আজও আমাকে পীড়া দেয়। তার একটা কারণ এই হতে পারে যে আমার যেন মনে হয়, তখন ওঁকে বুঝিয়ে বলতে পারি নি এমন অনেক জিনিস আজ আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করা সহজ হতো। তাহলেও এটা আশ্চর্য বলতে হবে যে সান ইসিদ্রোর আরোগ্যকালীন সেই দিনগুলির জন্য রবীন্দ্রনাথ এক ধরনের কাতরতা বোধ করতেন। নানা সময়ে চিঠিপত্রে সে-কথা আমাকে জানিয়েছেন। আর উনি এমন মানুষ ছিলেন না যে নিছক করুণাবশত বানিয়ে কোনো কথা বলবেন। লিখছেন: 'বড়ো নদীর ধারের সেই-যে বাড়িটিতে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে, আর তার বিচিত্র সব ক্যাকটাসের নুয়ে-পড়া অজানা অদ্ভুত কত ভঙ্গি, সে-সব স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে আমার মনে, যেন কোনো দুর্ভেদ্য বাধার ওপার থেকে ভেসে-আসা আমন্ত্রণ। এমন-সব

অভিজ্ঞতা আছে যা মানুষের প্রতিদিনের জীবন থেকে দূরে সরানো রত্নদ্বীপের মতো, চিরকালের মতো রহস্যময় থেকে যায় তার মানচিত্র। আমার আর্জেন্টিনার উপাখ্যানও এই ধরনের একটি। ইতিমধ্যেই হয়তো তুমি জানো যে ভাস্বর সেই দিনগুলি আর তার কোমল শুশ্রূষার স্মৃতিপুঞ্জ ধরা আছে আমার কবিতাগুচ্ছে, হয়তো আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। পলাতক স্মৃতিগুলি আজ কথায় বন্দী। ভাষার অপরিচয়ে তুমি কোনোদিন একে জানবে না, কিন্তু তোমাকে নিশ্চিত বলতে পারি যে এ-কবিতা বেঁচে থাকবে অনেকদিন।'[২৭]

১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে লেখা এই চিঠিতে যে বাঙলা বইটির উল্লেখ আছে তার নাম 'পূরবী'।[২৮] ১৯২৫ সালেই কলকাতা থেকে একটি চিঠিতে এই কবিতাসংগ্রহের প্রকাশ বিষয়ে জানিয়েছিলেন: 'বাঙলায় লেখা একটি বই তোমাকে পাঠাচ্ছি, নিজের হাতে দিতে পারলেই ভালো লাগত। এ-বই তোমাকেই উৎসর্গ করা, যদিও তুমি জানতে পাবে না কী আছে এর মধ্যে। সান ইসিদ্রোতে যখন ছিলাম, এর অনেক কবিতাই তখনকার লেখা। ভরসা করি, এর লেখক তোমার পাশে যতদিন থাকতে পেরেছে, তার চেয়ে বেশিদিন থাকতে পাবে এ বই।'[২৯] রবীন্দ্রসদনের অধ্যক্ষ শ্রীক্ষিতীশ রায়[৩০] পরে এর বেশ কয়েকটি লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ ক'রে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই এখানে তাঁর ফিরে আসবার ইচ্ছে জানাতেন। বুয়েনস আইরেসে যখন পি. ই. এন্-এর[৩১] অধিবেশন হলো, সে সময়ে ওঁকে আমন্ত্রণ জানাই নি ব'লে মৃদু তিরস্কারও করেছিলেন। লিখেছিলেন যে বয়োভার এবং জীর্ণ স্বাস্থ্য সত্ত্বেও এখানে আসবার জন্যে উনি তৈরি ছিলেন।[৩২]

১৯৩০এর সেপ্টেম্বরে রলাঁ লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশে বেঁচে আছেন নির্বাসিতের মতো।[৩৩] এ-জন্যেই ওঁর দরকার হচ্ছিল

pathagar.net

ঘুরে বেড়ানো, পরিব্রজন। রলাঁ জানালেন যে তরুণেরা রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়ছে গান্ধীজীর দিকে। জানালেন, 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসে যে ভারতবর্ষের কথা আছে, ভারত আজ আর ঠিক তেমন নেই।[৩৪]

এর থেকে মনে পড়ল আর্জেন্টিনার এক সম্পাদকের কথা। কে একজন প্রস্তাব করেছিলেন 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'[৩৫] বইটির অনুবাদ প্রকাশ করা হোক। সম্পাদক বললেন: 'অনুবাদ? কেন? ফর্স্টার যে ব্রিটিশ উপনিবেশের বর্ণনা করেছেন, ভারতবর্ষে আজ আর সে-চেহারা নেই।'

'ঘরেবাইরে'র মূল্য কখনো নষ্ট হয় না, রুশদেশের জারশাসন লুপ্ত হয়ে গেলেও 'যুদ্ধ ও শান্তি'[৩৬] উপন্যাসের মূল্য কমে না। অল্পবয়সীরা কিছুদিনের জন্য একটি মহৎ উপন্যাসকে উপেক্ষা করতেও পারে। কিন্তু আরেক প্রজন্ম এসে তাকে নতুন ক'রে আবিষ্কার ক'রে নেবে, পুরোনো তরুণেরা ততদিনে কবরে!

রোমঁ্যা রলাঁ আগে বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের শেষের বছরগুলি কাটছিল মস্ত দুঃখে। নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যেই উনি মন দিয়েছিলেন ছবি-আঁকায়। খানিকটা বিনোদনের জন্যেই না কি পারীর একদল 'গৃহী মানুষে'র আমন্ত্রণ মেনেছিলেন উনি, আর তাঁরা না কি ছিলেন 'একেবারেই ওঁর অনুপযুক্ত'। 'আমাদের ফরাসি বন্ধুরা' বেশ না কি নিন্দে করেছিলেন তাঁর এই চপলতার।[৩৭]

ঘটনাটি কিন্তু এইরকম। রলাঁ যে-সময়কার কথা বলছেন, তখন আমিই ছিলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী। পারীতে উনি কদিন ছিলেন সে-সময়ে,[৩৮] কাপ মার্তঁ্যা থেকে ফিরে ওখানে কদিন ছিলেন তখন। আর সান ইসিদ্রোতে যেমন এখানেও তেমনি, আমিই ওঁর দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। দেখাশোনা বলতে গাড়িতে এখানে-ওখানে

boiRboi.net

নিয়ে যাওয়া, পোশাক-আশাকের তদারকি, খানিকটা-বা মধ্যস্থ আর দোভাষীর কাজ করা। ফলে কাদের সাহচর্যে তিনি থাকতেন সেটা জানবার আমার সুযোগ ছিল। রোমঁ্যা রলাঁর প্রাপ্য সমস্ত মর্যাদা তাঁকে দিয়েও ঘটনাটার সত্য আমাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ব্যাপারটা ঠিকমতো বোঝাতে গেলে ফিরে যেতে হয় সেই দিনগুলিতে, যখন কবি মিরালরিও পৌঁছন।

ওঁর একটি ছোটো খাতা টেবিলে প'ড়ে থাকত, ওরই মধ্যে কবিতা লিখতেন বাঙলায়। বাঙলা ব'লেই যখন-তখন খাতাটা খুলে দেখা আমার পক্ষে তেমন দোষের ছিল না। এই খাতা আমায় বিস্মিত করল, মুগ্ধ করল। লেখার নানা কাটাকুটিকে একত্র জুড়ে দিয়ে তার ওপর কলমের আঁচড় কাটতে যেন মজা পেতেন কবি। এই আঁকিবুঁকি থেকে বেরিয়ে আসত সব রকমের মুখ, প্রাগৈতিহাসিক দানব, সরীসৃপ অথবা নানা আবোলতাবোল। সমস্ত ভুল, সমস্ত বাতিলকরা লাইন, কবিতা থেকে বহিষ্কৃত সব শব্দ এমনি ক'রে পুনর্জীবিত হতো এক রূপের জগতে, আমাদের দিকে তাকিয়ে যেন স্নিগ্ধ কৌতুকে হাসত তারা, নয়তো তাকিয়ে থাকত একটু বাঁকা মুখে, মেলে ধরত যেন কোনো অজানা প্রাণীর ভয়ংকর দৃষ্টি। কাকুতি ক'রে বললাম, এর কয়েকটি পৃষ্ঠার ছবি তুলতে দিতে হবে আমায়। আমাকে খুশী করবার জন্যে উনি রাজিও হলেন। এই ছোটো খাতাটিই হলো শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সূচনাপর্ব।[৩৯] কবিতার মধ্যে শব্দ খোঁজা ব্যাপারটাকে রেখায় রূপান্তর দেওয়া থেকেই এই শিল্পের জন্ম। তাঁর এই আঁকি-বুঁকিতে (যখন অন্য কিছু ভাবছি বা কোনো উৎকণ্ঠায় আছি তখন যেসব কাটাকুটি করি, ইংরেজরা তাকে বলে doodles) আমি তো মেতে গেলাম। ব্যাপারটায় ওঁকে উশকে দিলাম। সান ইসিদ্রোর ছ'বছর পর পারীতে যখন দেখা হলো কবির সঙ্গে, ওঁর ওই খেলা তখন

দাঁড়িয়ে গেছে ছবিতে।[৪০]

পারীতে ব'সে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম পাওয়া গেল, দ্রুত গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন কাপ মার্তঁ্যায়।[৪১] তাঁর নতুন ছবি সব দেখাতে চান। সেগুলি এতই মৌলিক লাগল আমার যে একটা প্রদর্শনীর প্রস্তাব ক'রে বসলাম, যেন ততটাই আমার অর্থসামর্থ্য ছিল। ভাগ্য ছিল ভালো, বন্ধুদেরও ধন্যবাদ, বিশেষ ক'রে জর্জ আঁরি রিভিয়্যারকে।[৪২] রবীন্দ্রনাথ এখানে পৌঁছবার অল্প পরেই পিগাল গ্যালারিতে প্রদর্শনীটির উদ্‌বোধন সম্ভব হলো।[৪৩] ব্যবস্থা করেছিলেন প্রাচ্য সুহৃৎসঙ্ঘ আর চিত্রসূচির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন কঁতেস মাথু দ্য নোয়াই।[৪৪] কিছুদিন পর ওই একই প্রদর্শনী হলো লণ্ডনে, মাসখানেক পরে বার্লিনে।[৪৫]

পারীতে থাকবার সময়ে এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদক আঁদ্রে জিদের সঙ্গে আলাপ করতে পেলেন। আমিও ছিলাম এই দেখাশোনার সময়ে, তবে কিনা বুদ্ধি ক'রে ওঁদের ছেড়ে দিয়েছিলাম একা, তাকিয়ে ছিলাম জানলার ঠিক নিচেই এক ফুলফলন্ত বাদাম গাছের দিকে। আমার অবশ্য মনে হয় না যে ওই দুজন মানুষের মধ্যে যথার্থ কোনো বিনিময় হতে পেরেছিল। এটা একটু আশ্চর্য, কেননা জিদের গীতাঞ্জলি অনুবাদের মতো এমন যোগ্য অনুবাদ আমি তো অন্তত কমই দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ বরং অনেক স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছিলেন পল ভালেরির[৪৬] সান্নিধ্যে। যদিও, ভালেরির নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের প্রতি জিদের মতো অতটা শ্রদ্ধা ছিল না। জিদের মজা হলো যে লেখায় তিনি পাঠকের সঙ্গে বেশ একটা অন্তরঙ্গতা তৈরি ক'রে নেন, কিন্তু কথাবার্তায় তার বিপরীত। অন্তত প্রথম পরিচয়ে তো বটেই। আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তো ওঁর প্রথম পরিচয়ই শেষ পরিচয়। জিদের ছিল একটা চাপা ধরন। তুলনায়, যিনি লেখায় এতটা বিষয়মুখী,

এ বিশ্বের অসীমতার মাঝে
আজ মোর সর্বসত্ত্ব করেছে মগন,—
এই স্তব্ধ [illegible] গগন
বাজায় অদৃশ্য সাফল্যে [illegible] পরাজয়ের সুর—
আমার [illegible] পাত্র [illegible] ঢেলে দেয় [illegible] সুদূর।

১১ নভেম্বর ভুয়েনোস আয়রিস
১৯২৪

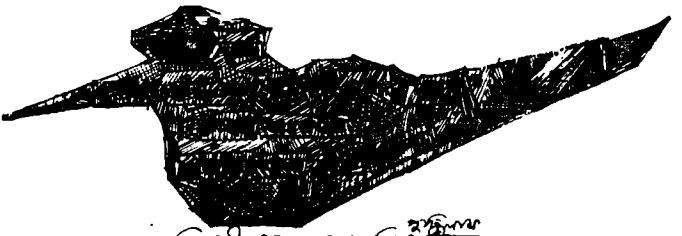

হে বিদেশী পুষ্প, তবে আমি [illegible],
কি তোমার নাম?
হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কি হবে?
আর কিছু নয়
হাসিতে তোমার পরিচয়।

pathagar.net

ওগো বৈতরণী,

[illegible] যাত্রীদের মত [illegible] আছ, নাই তার ছবি, —

নাই তার [illegible],—

নাই রূপ, নাই স্পর্শ, ছন্দে তার নাই কোনো সীমা, —

[illegible] রজনীর

[illegible] স্তব্ধ স্থবির

নিরাকার পদচারে [illegible] [illegible] —

[illegible] প্রহরের মত

প্রাণের [illegible] হতে

[illegible] শ্বাস' [illegible] [illegible]

[illegible] না থাকে চিহ্ন, নাহি থাকে [illegible],

[illegible] না থাকে [illegible] কথা।

ওগো বৈতরণী,

[illegible] তোমার খেয়ার তরী

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] বিশ্বের [illegible],

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [

নৈর্ব্যক্তিক, সেই ভালেরির সঙ্গে কথা বলা বরং সহজ। রবীন্দ্রনাথ তো সঙ্গে সঙ্গেই ওঁকে পছন্দ করলেন। আর ভালেরি মুগ্ধ হয়েছিলেন (সেইরকম অন্তত লিখেছেন তাঁর ডায়ারিতে)বাঙালি কবির ইংরেজি বলা শুনে।

এই দুজন লেখক ছাড়া রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল জ্যাঁ কাসু,[৪৭] মাদাম দ্য নোয়াই, জর্জ আঁরি রিভিয়্যারের সঙ্গে। ডক্টর ব্যু'র আস্তানায় এক মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা ছিল, সেখানে কবির সঙ্গে ছিলেন ব্রেমঁ,[৪৮] মুনিয়ের, ভালেরি, কঁতেস—এঁরা সব। আমার মনে আছে, পরিবেশন করা হচ্ছিল বিশেষ একটা পদ, লেবু-জড়ানো হাঁসের মাংস।[৪৯] খেতে আমার ভালোই লাগে, কিন্তু হাঁসটাকে যে মনে আছে সে তার সুস্বাদের জন্য নয়। কারণটা অন্য। পাশেই ব'সে ছিলেন মুনিয়ের। আমার দিকে ঈষৎ ঝুঁকে এসে বললেন: 'ভাবুন একবার ব্যাপারটা, এই হাঁসটাকে এঁরা কিনা শেষ পর্যন্ত একটা কবিতায় দাঁড় করিয়ে দেবেন!'

এই যাঁদের কথা বলা গেল, এর মধ্যে অন্তত চারজন শিল্পজগতে এতই খ্যাতনাম যে রলাঁ বিষয়ে এঁদের ঈর্ষান্বিত হবার কোনো কারণ দেখি না। অবশ্য জানি এ-ধরনের তুলনা কুরুচির পরিচয়। এ প্রসঙ্গের তাই এখানেই ইতি করছি।

আমি আবারও বলছি, রলাঁ ভুল করেছিলেন। ভারতবর্ষে তখন একটা নাটকীয় উত্তেজনার সময় চলছে ঠিকই,[৫০] কিন্তু তাহলেও সে-সময়ে সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম ক'রে রবীন্দ্রনাথ যে চিত্রশিল্পের প্রতি উন্মুখ হয়ে পড়েছিলেন, এতে চপলতা বা নিন্দনীয়তা কিছু নেই। জানি, দেশের নেতৃদল তখন কারারুদ্ধ। রলাঁ তাই অনুযোগ করছেন, 'রবীন্দ্রনাথ পালিয়ে গেলেন আরেক জগতে।' কিন্তু সত্যি বলতে, রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে তো এক দ্বৈধ ছিল। সুন্দরের আর প্রজ্ঞার

Pathagar.net

দুই ভিন্ন আহ্বানে সাড়া দেবার মতো তাঁর ভিন্ন দুই স্বভাব, তাঁর সুপ্ত শিল্পী আর সুপ্ত গুরুর স্বভাব—এর মধ্যে সব সময়েই একটা সংঘর্ষ ছিল। আর এই সংকট মুহূর্তে শেষ অবধি তাঁর মধ্যে শিল্পীই হয়ে উঠত বড়ো। এ যদি হয় পাপ, তবে এ পাপ থেকে যে শিল্পী মুক্ত তিনিই যেন এগিয়ে আসেন প্রথম ঢিলটি ছুঁড়তে। আর যাঁদের বসবাস শিল্পজগতের বাইরে, তাঁদের কোনো অধিকার নেই ওঁকে বিচার করবার। উদ্‌ভ্রান্ত সেই কয়েক মাসে, কবিতাকে ছবিতে অনুবাদ করবার জ্বরোত্তাপে রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয় মনে হয়েছিল যে শ্রমসাধ্য তাঁর অনেক কীর্তিচূড়া ভেঙে পড়বার বহুদিন পরেও জ্বলজ্বল করতে থাকবে তাঁর জলরঙ। শিল্পীরা ও-রকমই ভাবেন।[৫২]

pathagar.net

ভালোবাসা[১]

Thou hast made me endless, such is thy pleasure.[২]

Gitanjali

আগেই লিখেছি, এদেশে যখন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অনুরাগী বা কৌতূহলীদের হাত থেকে ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হতো অহরহ। সাহিত্যে বা প্রাচ্য দর্শনে একেবারেই কোনো উৎসাহ নেই, এমনও কত লোকের যে কৌতূহল জাগত ওঁকে ঘিরে! একটা গল্প বলি, এ কেউ জানে না।

জাঁদরেল এক অস্ট্রীয় মহিলা—আমার প্রায় চল্লিশ বছরের সঙ্গী, আমার সঙ্গে এমন জবরদস্তি ব্যবহার করেন যেন আমি একটা বাচ্চা মেয়ে—ফ্যানি তাঁর নাম, রবীন্দ্রনাথের বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন তিনি। রোজই ভোরবেলা চ'লে আসতেন। কবির পোশাকপত্র দেখাশোনা করবার দায়টাও উনি নিয়ে নিলেন। এমন-কী ওঁদের কথাবার্তাও চলতে লাগল খুব, যদিও একজন শুধু ইংরেজি বলেন, আরেকজন কেবলই স্পেনীয়। হোটেলে বা জাহাজে সব সময়ে যে-জিনিসটা আমি চাইতাম সেই Tea-strainer হলো ফ্যানির জানা একমাত্র ইংরেজি শব্দ। এই একটিমাত্র শব্দের দৌলতে ওঁদের সংলাপ যে খুব-একটা এগোত, এমন তো আমার বোধ হয় না। তবুও ওঁরা কথা ব'লে যেতেন, বোধ করি ঠারেঠোরে।

একদিন ব'লে বসলেন ফ্যানি: 'দেখো বাছা, কবির জামা-কাপড়ের মেরামতি ক'রে দেওয়াটা দরকার হয়ে পড়েছে। এমন-না যে তাতে আমার কোনো আলসেমি আছে, তবে আমার মনে হয় যে

pathagar.net

ভদ্রলোকের কিছু গরম পশ্‌মি জিনিস চাই, শীত আসছে তো!' ফরাসি এক দরজির দোকান আছে আর্জেন্টিনায়, পরদিনই দৌড়োলাম সেখানে। এখানে ফ্রান্সের সবচেয়ে দামি উল মিলবে জানতাম। একটা উল পছন্দ করলাম, কবির একটা জোব্বা সংগ্রহ করলাম, আর দোকানের কর্ত্রী অ্যালিসকে ব'লে দিলাম ঠিক অমনি একটা বানিয়ে দিতে। উপরন্তু জানালাম: 'দেখো ভাই অ্যালিস, (শুনতে পাচ্ছ, অ্যালিস?) আমি যে তোমায় রবীন্দ্রনাথের জন্য একটা উলের জোব্বা তৈরি করতে বলেছি, এ যেন কাউকে ঘুণাক্ষরেও বোলো না।' অ্যালিস দিব্যি ক'রে বলল যে সে মোটেই এ ব্যাপারে মুখ খুলছে না। গুজব যাতে না ছড়ায় সে-জন্যে বরং দরজিদের সে ব'লে দেবে যে এ একটা ফ্যান্সি ড্রেস-এর জন্য পোশাক তৈরি হচ্ছে। দোকান ছেড়ে বেরুব, তখন মেয়েটি জিজ্ঞেস করছে 'ট্রায়ালের জন্য সান ইসিদ্রোতে কখন যাব?' 'ঠাট্টা রাখো, ট্রায়ালের দরকার নেই, যে-জামাটি দিয়েছি ঠিক-ঠিক তার একটা নকল বানিয়ে দাও।' একটু লাজুকভাবে অ্যালিস তাকাল আমার দিকে, তারপর ব'লেই বসল যে সান ইসিদ্রোতে কবির হাতে এটা পৌঁছে দিতে পারলে সে একেবারে ধন্য হয়ে যাবে। তাছাড়া কিছু অদল-বদলেরও তো দরকার হতে পারে। 'আ, অন্তত ওঁর শ্মশ্রুমণ্ডলে যদি একবার হাত রাখতে পারি!' একটু চম্‌কে গিয়ে, কোনোমতে হাসি চেপে, ওকে বুঝিয়ে বললাম যে সবারই যেমন হয়ে থাকে কবিরও তেমনি শ্বেতশ্মশ্রু, ওর মধ্যে কোনো অলৌকিক বিভা নেই। অ্যালিস বলে উঠল: 'কিন্তু ছবিতে যে ওঁকে দেখি ঈশ্বরের মতো, পরম পিতা!' যুক্তিটা শেষ পর্যন্ত মনে ধরল। এই-যে ফরাসি মেয়েটি ভাবছে সে এক ভারতীয় ঈশ্বরকে দেখতে পাবে, সেন্ট পিটারের পদচুম্বনের মতোই পবিত্র বোধ করবে আলতো একটু শ্মশ্রুস্পর্শে—আমি ওকে বাধা দেবার কে?

pathagar.net

ফলে এই দাঁড়াল যে অ্যালিস—অন্যতম শ্রেষ্ঠ দরজি প্রতিষ্ঠান Paquin Company-র বুয়েনস আইরেস শাখার নেত্রী—শেষে একদিন হাঁটু পেতে ব'সে, ঠোঁটে অনেকগুলি পিন চেপে ধ'রে, বিমূঢ় কবির পদপ্রান্তে ওঁর জোব্বার পাড় ঠিকঠাক করতে লাগল। আমার অতিথিমশাইকে অবশ্য আগেই সতর্ক ক'রে রেখেছিলাম: 'ব্যস্ত হবেন না যেন। ইনি চাইছেন আপনার পোশাক ঠিক ক'রে দিতে। তাছাড়া উনি ক্যাথলিকদের কোনো কোনো পবিত্র মূর্তির সঙ্গে আপনার সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন।' রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন যে এ কোনো পাড়াপড়শি ছোটোখাটো দোকানী, ভুলটুল ক'রে আমার বকুনি খাবে এই ভয়ে তটস্থ!

বিজয়িনী অ্যালিসকে (কেননা শ্মশ্রুস্পর্শের সুযোগ ওর ঘটেছিল) দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে মনে করিয়ে দিলাম: 'কাউকে যেন বোলো না, এর একটি কথাও যদি বলো তো ভগবান তোমার ভালো করবেন না।' আর অ্যালিস বলল: 'কী সুন্দর! ভাগ্যিস কাছ থেকে ওঁকে দেখতে চেয়েছিলাম!'

আসলে আমার ভয় হয়েছিল যে খুঁতখুঁতে বা গুজবপ্রবণ লোকেরা শুনে হয়তো শিউরেই উঠবেন যে রবীন্দ্রনাথের পোশাক করতে ডাকা হয়েছিল Paquinকে। বলাই বাহুল্য যে আজ টের পাচ্ছি রোমঁ্যা রলাঁর সেই বন্ধুবান্ধবেরা এসব শুনলে নিশ্চয় হতাশ-ভাবে মাথা নাড়তেন। কিন্তু এটা অন্যায় নয় যে কবির পোশাকের দরকার হয়েছিল, আর সেটা তৈরি ক'রে দেবার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবার মতো ভালোমানুষও ছিলাম না আমি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ভিতরের কথা কিছুই জানতে পারেন নি। অ্যালিস আর আমার ষড়যন্ত্রের সহজ শিকার হয়েছিলেন তিনি। অনেকদিন পরেও ছবি পাঠাতেন দেশ থেকে, সান ইসিদ্রোয় বানানো সেই জোব্বা পরা

ছবি। কী সুন্দর পোশাক পাওয়া যায় বুয়েনস আইরেসে, বলো দেখি।[৪]

সৌজন্যবশে যেসব কথা উত্থাপন করা একেবারেই সংগত নয়, কবি হালকা মেজাজে থাকলে তা নিয়ে কখনো কখনো একটু মজাও করতাম। একবার বলেছিলাম : 'অল্প বয়সে বিলেতে যখন পড়াশোনা করতেন তখন নিশ্চয় সাংঘাতিক ছিলেন আপনি। ইংরেজ মেয়েগুলি সবাই নিশ্চয় আপনার প্রেমে পাগল হয়েছিল। সত্যি না?' খুব গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থেকে বলতেন : 'সত্যিই তো।' আর তারপরেই শুরু হতো হাসি।

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ যেসব কারণে শেক্সপীয়রকে পছন্দ করেছিলেন, আমারও শেক্সপীয়র-প্রীতি ছিল সেই একই কারণে : 'রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের প্রলয়দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে-একটা প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত। আমাদের সমাজ, আমাদের ছোটো ছোটো কর্মক্ষেত্র এমন-সকল নিতান্ত একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা যে সেখানে হৃদয়ের ঝড়-ঝাপট প্রবেশ করিতেই পায় না, সমস্তই যথাসম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ; এই জন্যই ইংরাজি সাহিত্যে হৃদয়াবেগের এই বেগ ও রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল যাহা আমাদের হৃদয় স্বভাবতই প্রার্থনা করে। সাহিত্যকলার সৌন্দর্য আমাদিগকে যে সুখ দেয় ইহা সে সুখ নহে, ইহা অত্যন্ত স্থিরত্বের মধ্যে খুব একটা আন্দোলন আনিবারই সুখ।'[৫]

ওঁর নিসর্গপ্রেমও যেন প্রকৃতির প্রতি আমার ভালোবাসার এক দর্পণ : 'বাড়ির ভিতরের নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে

pathagar.net

অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত।'[৬]

স্বাধীনতা বিষয়ে ওঁর ধারণার সঙ্গেও মিল ছিল আমার মনের : 'প্রবলপক্ষেরা সর্বদাই স্বাধীনতার অপব্যবহার লইয়া খোঁটা দিয়া স্বাধীনতাকে খর্ব করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যয় করিবার যদি অধিকার না থাকে তবে তাহাকে স্বাধীনতাই বলা যায় না। অপব্যয়ের দ্বারাই সদ্‌ব্যয়ের যে শিক্ষা হয় তাহাই শিক্ষা। অন্তত, আমি একথা জোর করিয়া বলিতে পারি, স্বাধীনতার দ্বারা যেটুকু উৎপাত ঘটিয়াছে তাহাতে আমাকে উৎপাত নিবারণের পন্থাতেই পৌঁছাইয়া দিয়াছে। শাসনের দ্বারা, পীড়নের দ্বারা, কানমলা এবং কানে মন্ত্র দেওয়ার দ্বারা, আমাকে যাহা-কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছুই আমি লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালোমন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে। আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে আমি যে-শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহাতে মন্দকেও আমি তত ভয় করি না, ভালো করিয়া তুলিবার উপদ্রবকে যত ডরাই ; ধর্ম নৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্যুনিটিভ পুলিশের পায়ে আমি গড় করি—ইহাতে যে দাসত্বের সৃষ্টি করে তাহার মতো বালাই জগতে আর কিছুই নাই।'[৭] এই মনোভাব থেকেই গ'ড়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদ আর একতন্ত্রের প্রতি তাঁর একান্ত ধিক্‌কার।

তাঁর ধর্মের বোধও আমার কাছে ধর্মের একমাত্র যোগ্য উপলব্ধি : 'আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে

নিজের মধ্যে উদ্‌ভূত ক'রে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না-পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।'[৮] 'আধুনিক মঠেমন্দিরে স্বার্থপরতা ঘৃণা আর অহমিকা সমবেতভাবে জেগে উঠছে জাতীয় প্রবৃত্তির মধ্যে, ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত ভক্তির ভাগ নিতেও তার কোনো সংকোচ নেই।'[৯]

না, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ তাহলে পাস্কালের ফ্রান্স অথবা আমার আমেরিকার থেকে খুব-একটা দূরের নয়। এসব ভাবনার মধ্যে এমন কিছু নেই যা আমারও ভাবনা হতে পারে না। ঠিক এভাবে সাজিয়ে হয়তো আমি বলতে পারতাম না, কেননা আমার কাছে এসব অনুভূতি ছিল অস্পষ্ট ভ্রূণের মতো—তবুও তা আমারই মধ্যে ছিল। তাই যখন দেখি যে একজন এ-কথার উচ্চারণ করছেন কিন্তু তা মেনে নিতে আমাকে বাধ্য করছে না কেউ, চোখ জলে ভ'রে আসে।

যাহোক, যেসব প্রসঙ্গে আমার নিবিড় কৌতূহল ছিল, কবির সঙ্গে তা নিয়ে কথা বলতাম কমই। যখন ওঁর সঙ্গে একা থাকতাম, শ্রদ্ধায় ভয়ে তখন যেন ফিরে যেতাম বয়ঃসন্ধির দিনগুলিতে। আমাদের সেকেলে বয়ঃসন্ধি, হাল আমলের ঔদ্ধত্য ছিল না সেখানে। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন ঠিকমতো ইংরেজি শব্দ খুঁজে পাই না ব'লেই এই নীরবতা। তা কিন্তু নয়, ভাষার ভয় নয়, ওঁরই ভয় আমাকে চেপে ধরেছিল। সেকথা ওঁকে বলবার সাহসও ছিল না আমার। উনি কেমন ক'রে বুঝবেন, ঝলমলে খুশীখুশী পোশাক-পরা এই তরুণী—অবাধ্য রোগীর শুশ্রূষাভার নিয়ে যে মেতে আছে, খাবার টেবিলে সব সময়েই যে বসছে সঙ্গে, ফুর্তিবাজ, কখনো কখনো স্তব্ধ,—তার মজ্জায় যে মিশে আছে ওঁরই রচনা? ফিরে যাবার পর জাহাজ থেকে

লিখেছিলেন একবার: 'আমরা যখন একসঙ্গে ছিলাম, পরস্পরের দিকে খোলা চোখে তাকাবার সমস্ত সুযোগ আমরা শব্দের খেলায় বা হাসির তোড়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছি। সেসব হাসি অস্পষ্ট ক'রে দিত আমাদের মনের আবহ, আচ্ছন্ন ক'রে দিত আমাদের দৃষ্টি।' বস্তুত, মস্ত একটা প্রভেদ ছিল আমাদের দুজনের মনোভাবে। রবীন্দ্রনাথ কী, তা আমি জানতাম; তাঁর লেখা প'ড়ে এবং তাঁর সান্নিধ্যে এসে এ ধারণা আমার পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আমাকে জেনে নেবার একমাত্র উপায় ছিল তাঁর বোধ, কেবলই বোধ। সান ইসিদ্রোতে পৌঁছবার অল্প দিনের মধ্যেই একটি কবিতা অনুবাদ ক'রে দিয়েছিলেন আমার হাতে: 'চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী'।[১০] কিন্তু আমার নীরবতা থেকে আমার ঠিক-ঠিক অভিপ্রায়টি তিনি চিনতেন কি না, আজ সন্দেহ হয়। আমাদের সম্পর্কটা ছিল নিতান্ত একপেশে। তাই হবার কথা, নিয়তিনির্বন্ধ! এজন্য আমার দুঃখের অন্ত ছিল না। উনি কখনো জানতে পাবেন না যে সাগরপার থেকে ভেসে-আসা এইসব কবিতা প'ড়ে বা শুনে আমার কেবলই মনে হতো, স্যাঁ-জন্ পার্সের ভাষায়, 'আবার আমি ফিরেছি আপন তীরে। একটিই শুধু ইতিহাস আছে, আত্মার ইতিহাস।'[১১]

প্রাচ্যের মনোভাব আমরা কতটুকু ধরতে পারি, এ নিয়ে বেশ খানিকটা সন্দেহ ছিল রবীন্দ্রনাথের। চাপাদমালালে, একদিন বিকেলে ওঁর ঘরে ঢুকেছি, ঠিক তখনি একটা কবিতা লেখা শেষ করেছেন উনি।[১২] লাল-পর্দা-ঘেরা বড়োসড়ো চৌকো এক শোবার ঘর। জানলাগুলি খোলা, হালকা সবুজে ভরা বাগান দেখা যায়, আর মেঘমুক্ত দূরের আকাশ। ঝকমক করেছে দামি কাঠের আসবাব। যোজন-যোজন নীরবতা ঘিরে আছে আমাদের। আর্জেন্টিনার নিঃশব্দ

বিস্তার আরো যেন গাঢ় হয়ে উঠছে গাভী আর মেষদলের শান্ত বিচরণে, দূর থেকে ভেসে-আসা তাদের বিষণ্ণ ডাকে। খানিক আগে বৃষ্টি ছিল, এখন বুক ভ'রে নিচ্ছি আটলান্টিকের চন্‌মনে হাওয়া। বললাম, 'চায়ের সময় হলো। কিন্তু নেমে আসবার আগে টেবিলের ওই কবিতাটি আমায় অনুবাদ ক'রে দিতে হবে।' পাতাটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, দেখছিলাম খুঁটিয়ে, কিছুই ধরতে পারছিলাম না বাঙলা অক্ষরের ওই সুচারু ছাঁদ। যেন বালির উপর হাঁসের না কি সিন্ধুসারসের পায়ের চিহ্ন। উনি অনুবাদ করতে শুরু করলেন প্রতিটি শব্দ ধ'রে ধ'রে, কখনো-বা ইতস্তত ক'রে। একটা জগৎ খুলে গেল আমার সামনে। বললাম পরে যেন এটি লিখে রাখেন। একেবারে হঠাৎ, যেন দৈবে, সরাসরি স্পর্শ পাওয়া গেল ওঁর কবি-প্রকৃতির, তাকে ধরতে হলো না অনুবাদের দস্তানাঘেরা হাতে। আলগা আঙুলে শব্দগুলিকে ছুঁতে পাবার আনন্দ যেন নষ্ট হয়ে যায় অনুবাদ-কবিতায়। স্পর্শাতীত আর স্পর্শযোগ্যকে, স্পর্শাতীত কবিতার সত্য আর স্পর্শযোগ্য দৈনন্দিন অসত্যকে ক্ষীণ সেতুতে বেঁধে দেয় যে শব্দ, একজন কবিই তো জানেন তার বুনুনি।

পরদিন সকালবেলা সেই কবিতাটি তিনি দিলেন আমায়, তাঁর স্পষ্ট পরিমিত ইংরেজি অক্ষরে লেখা। সঙ্গে সঙ্গেই প'ড়ে নিলাম, কিন্তু লুকোতে পারলাম না আমার মনোভঙ্গ। ব'কেই উঠলাম, বললাম: 'কাল যা পড়েছিলেন তার অনেকটাই তো দেখছি নেই এর মধ্যে। এমন-সব ব্যাপার ছেড়ে দিয়েছেন যা ছিল কবিতাটির প্রাণ।' উত্তরে জানলাম যে ওঁর মনে হয়েছে সেসব অংশ পশ্চিম-বাসীদের ভালো লাগবে না হয়তো। এক ঝলক রক্ত উঠে এলো আমার মুখে, কেউ যেন মেরেছে আমাকে। কবি অবশ্য আন্তরিক-ভাবেই জবাব দিয়েছিলেন, আমাকে নিশ্চয় অপমান করতে চান নি।

এর আগে কখনোই উত্তেজিত হই নি ওঁর সামনে, কিন্তু আজ খানিকটা তীব্র স্বরেই বলতে হলো যে একটা সর্বনেশে ভুল করেছেন উনি।

আরেকদিনের কথা, এ-ও চাপাদমালালে। চাপাদমালালে বেশ কয়েকদিন ছিলাম,[১৩] কেননা বাইরের লোকজন এখানে কম আসতে পেত, অন্তত বিকেলগুলি তো আমরা নিজের মতো ক'রে পেতাম। বোদলেয়রের একটি কবিতা অনুবাদ ক'রে শোনাচ্ছিলাম ওঁকে। 'গীতাঞ্জলি'র কবি কীভাবে নেন 'পাপের ফুল'এর[১৪] কবিকে, তা দেখবার কৌতূহল হচ্ছিল খুব। পড়ছিলাম 'ভ্রমণের আহ্বান', যেখানে বলা হচ্ছে :

সেই দেশে তোর ঘরে
রশ্মি ঠিকরে পড়ে
বহু বৎসরে উজ্জ্বল আসবাবে
বিরল ফুলের তোড়ায়
পাগল গন্ধ ছড়ায়
ঝাপসা ধূপের অনুকূল অনুভাবে।
কারু খিলানের কোণে
তলহীন দর্পণে
প্রাচ্য দেশের বৈভব বাঁধে বাসা...[১৫]

অমনি কবি বাধা দিলেন। বললেন: 'ভিক্টোরিয়া, তোমার এই আসবাবের কবিকে আমার ভালো লাগছে না।' হা! মস্ত এই ফরাসি কবিকে শেষে কি না আমি আর্জেন্টিনার এক নিলামদারের ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছি, যেন তিনি আমদানিকরা ভালো কিছু আসবাবের নিলেম ডাকছেন।[১৬]

পারীতে যখন রবীন্দ্রনাথকে আবার দেখি (১৯৩০), উনি চেয়েছিলেন যে আমি ওঁর ভ্রমণের সঙ্গিনী হই। অক্সফোর্ডে যাচ্ছিলেন এক

pathagar.net

বক্তৃতার জন্য। এর চেয়ে প্রলোভনের আর কী হতে পারত! সে-সুযোগটা হারিয়েছি ব'লে আজও আমার কষ্ট হয়। কিন্তু নিউইয়র্কে তখন ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্কের সঙ্গে আলাপচারি চলছে দ্বিভাষিক একটি পত্রিকা প্রকাশের সম্ভাবনা নিয়ে।

কেন ইংল্যাণ্ডে যেতে পারছি না তা বুঝিয়ে লিখলাম: 'দক্ষিণ আমেরিকায় আমাদের যে অভিজ্ঞতা, উত্তর আমেরিকায় ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্কদেরও তাই। আমরা যখন একই ধরনে ভাবছি, নিজেদের যখন একই ধরনের অনাথ ব'লে বুঝতে পারছি আমরা—তখন মনে হলো যে ইওরোপ থেকে একদিন হয়তো নিজেদের মুক্ত ক'রে নিয়ে দাঁড়াতে পারব। ইওরোপের অভাব আমরা দু'জনেই খুব টের পাই। কিন্তু ইওরোপে দিন কাটানোর সময়ে তার কাছে আমাদের প্রত্যাশিত পরিপোষণ পাই না একেবারেই। কী যেন একটা নেই। এক কথায়, বেশ বুঝতে পারি যে আমরা আমেরিকারই মানুষ: এই বর্বর অপরিণত অসম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল আমেরিকার। এই আমেরিকা, যে আমাদের দুঃখই দেয় বিচ্ছেদই দেয়, অথচ এ অভিযোগ মনে রেখেও যার জন্য আমরা সব দুঃখই বরণ করতে প্রস্তুত। একটি দ্বিভাষিক পত্রিকার পরিকল্পনা করছি দুজনে, যতটা পারা যায় আমেরিকারই সমস্যা নিয়ে সেখানে ভাবব, আবার ইওরোপের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিকে তুলে ধরবারও ব্যবস্থা থাকবে সেখানে। এ হয়তো একটা কাজের মতো কাজ হতে পারে।'

পত্রিকাটির তখনো নাম ঠিক হয় নি ('Sur' বা 'দক্ষিণ' নামে এটি এখন বেরোয়), আর শেষ পর্যন্ত দ্বিভাষিকও করা যায় নি একে। এখন এর বয়েস হলো তিরিশ বছর,[১১] কিন্তু এখনো আমি জোর ক'রে বলতে পারছি না যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী না হয়ে সেদিন ঠিক কাজ করেছি। সেই ভ্রমণ সেদিন আমাকে পৌঁছে দিতে পারত

একেবারে ভারতবর্ষ পর্যন্ত।

পারীর গার্ দ্যু নর্ প্লাটফর্মে (জুন ১৯৩০) তাঁকে আমার শেষ আলিঙ্গন।[১৮] সঙ্গে ছিলেন বন্ধু অ্যাণ্ডরুজ, তাছাড়া তাঁর নতুন সচিব আরিয়াম[১৯] (পরে ইনি গান্ধীরও সেক্রেটারি হন)। আর কোনো-দিন দেখা হবে না ওঁর সঙ্গে, যোগ থাকবে কেবল চিঠিপত্রে। সান ইসিদ্রোতে বিছানার পাশে ওঁর যে ইজিচেয়ারটি[২০] থাকত, শান্তি-নিকেতন পর্যন্ত গিয়েছিল যেটি, তাঁর মৃত্যুর পর সেটি রাখা আছে ওখানকার মিউজিয়মে। কোনো কোনো চিঠিতে চেয়ারটির কথা কৌতুকভরে লিখতেন : 'দিনরাত্রির বেশির ভাগ সময় এই চৌকিটার উপর ব'সে কাটাই। সেই-যে আমরা বোদলেয়রের কবিতাটি পড়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত এর থেকেই তার একটা কাব্যিক তাৎপর্য ধরা গেল।'[২১] আবার, মেয়েদের প্রসঙ্গে অর্তেগার লেখা একটি প্রবন্ধের[২২] ইঙ্গিত দিয়ে দীর্ঘ এক পরিহাসময় চিঠি লিখেছিলেন একবার, তার শেষটায় ছিল : 'লোকে সাবধান করে যে মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা করতে নেই। কিন্তু ভয় হচ্ছে যে এই চিঠির অনেক অংশেই বুঝি একটু চপলতা ঘটে গেল। সেটা তোমাকে ক্ষমা করতে হবে। নিশ্চয় বুঝতে পারবে, যাকে ঋষি বানানো হয়েছে, সত্যিই যে ঋষি নয়, লোকে ভুল বুঝলেও কখনো কখনো তার হাসির স্রোতে গা ঢেলে দেওয়া দরকার।'[২৩]

অন্তত আমি যে হাসির পক্ষে, এটা জানতেন। তেমন-তেমন মুহূর্তেও হাস্যরসটা ঋষিদের পক্ষে নিষিদ্ধ কি না, আমার ঠিক জানা নেই। আমার তো ধারণা, পরম হাস্যহীনতা আসলে ভুয়ো ঋষিদেরই জগৎ। রবীন্দ্রনাথ বলতেন : 'আত্মস্থতা অর্জনের যে দুঃখ, তার কিছু লাঘব হয় যদি নিজেকে নিয়েও কেউ হাসতে পারেন।'

১৯২৪ সালের পৃথিবীর পক্ষে বিচিত্র বিরোধে ভরা রবীন্দ্রজীবনের

pathagar.net

বক্তৃতার জন্য। এর চেয়ে প্রলোভনের আর কী হতে পারত! সে-সুযোগটা হারিয়েছি ব'লে আজও আমার কষ্ট হয়। কিন্তু নিউইয়র্কে তখন ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্কের সঙ্গে আলাপচারি চলছে দ্বিভাষিক একটি পত্রিকা প্রকাশের সম্ভাবনা নিয়ে!

কেন ইংল্যাণ্ডে যেতে পারছি না তা বুঝিয়ে লিখলাম: 'দক্ষিণ আমেরিকায় আমাদের যে অভিজ্ঞতা, উত্তর আমেরিকায় ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্কদেরও তাই। আমরা যখন একই ধরনে ভাবছি, নিজেদের যখন একই ধরনের অনাথ ব'লে বুঝতে পারছি আমরা—তখন মনে হলো যে ইওরোপ থেকে একদিন হয়তো নিজেদের মুক্ত ক'রে নিয়ে দাঁড়াতে পারব। ইওরোপের অভাব আমরা দু'জনেই খুব টের পাই। কিন্তু ইওরোপে দিন কাটানোর সময়ে তার কাছে আমাদের প্রত্যাশিত পরিপোষণ পাই না একেবারেই। কী যেন একটা নেই। এক কথায়, বেশ বুঝতে পারি যে আমরা আমেরিকারই মানুষ: এই বর্বর অপরিণত অসম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল আমেরিকার। এই আমেরিকা, যে আমাদের দুঃখই দেয় বিচ্ছেদই দেয়, অথচ এ অভিযোগ মনে রেখেও যার জন্য আমরা সব দুঃখই বরণ করতে প্রস্তুত। একটি দ্বিভাষিক পত্রিকার পরিকল্পনা করছি দুজনে, যতটা পারা যায় আমেরিকারই সমস্যা নিয়ে সেখানে ভাবব, আবার ইওরোপের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিকে তুলে ধরবারও ব্যবস্থা থাকবে সেখানে। এ হয়তো একটা কাজের মতো কাজ হতে পারে।'

পত্রিকাটির তখনো নাম ঠিক হয় নি ('Sur' বা 'দক্ষিণ' নামে এটি এখন বেরোয়), আর শেষ পর্যন্ত দ্বিভাষিকও করা যায় নি একে। এখন এর বয়েস হলো তিরিশ বছর,[১৭] কিন্তু এখনো আমি জোর ক'রে বলতে পারছি না যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী না হয়ে সেদিন ঠিক কাজ করেছি। সেই ভ্রমণ সেদিন আমাকে পৌঁছে দিতে পারত

একেবারে ভারতবর্ষ পর্যন্ত।

পারীর গার্ দ্যু নর্ প্লাটফর্মে (জুন ১৯৩০) তাঁকে আমার শেষ আলিঙ্গন।[১৮] সঙ্গে ছিলেন বন্ধু অ্যাণ্ডরুজ, তাছাড়া তাঁর নতুন সচিব আরিয়াম[১৯] (পরে ইনি গান্ধীরও সেক্রেটারি হন)। আর কোনো-দিন দেখা হবে না ওঁর সঙ্গে, যোগ থাকবে কেবল চিঠিপত্রে। সান ইসিদ্রোতে বিছানার পাশে ওঁর যে ইজিচেয়ারটি[২০] থাকত, শান্তি-নিকেতন পর্যন্ত গিয়েছিল যেটি, তাঁর মৃত্যুর পর সেটি রাখা আছে ওখানকার মিউজিয়মে। কোনো কোনো চিঠিতে চেয়ারটির কথা কৌতুকভরে লিখতেন : 'দিনরাত্রির বেশির ভাগ সময় এই চৌকিটার উপর ব'সে কাটাই। সেই-যে আমরা বোদলেয়রের কবিতাটি পড়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত এর থেকেই তার একটা কাব্যিক তাৎপর্য ধরা গেল।'[২১] আবার, মেয়েদের প্রসঙ্গে অর্তেগার লেখা একটি প্রবন্ধের[২২] ইঙ্গিত দিয়ে দীর্ঘ এক পরিহাসময় চিঠি লিখেছিলেন একবার, তার শেষটায় ছিল : 'লোকে সাবধান করে যে মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা করতে নেই। কিন্তু ভয় হচ্ছে যে এই চিঠির অনেক অংশেই বুঝি একটু চপলতা ঘটে গেল। সেটা তোমাকে ক্ষমা করতে হবে। নিশ্চয় বুঝতে পারবে, যাকে ঋষি বানানো হয়েছে, সত্যিই যে ঋষি নয়, লোকে ভুল বুঝলেও কখনো কখনো তার হাসির স্রোতে গা ঢেলে দেওয়া দরকার।'[২৩]

অন্তত আমি যে হাসির পক্ষে, এটা জানতেন। তেমন-তেমন মুহূর্তেও হাস্যরসটা ঋষিদের পক্ষে নিষিদ্ধ কি না, আমার ঠিক জানা নেই। আমার তো ধারণা, পরম হাস্যহীনতা আসলে ভুয়ো ঋষিদেরই জগৎ। রবীন্দ্রনাথ বলতেন : 'আত্মস্থতা অর্জনের যে দুঃখ, তার কিছু লাঘব হয় যদি নিজেকে নিয়েও কেউ হাসতে পারেন।'

১৯২৪ সালের পৃথিবীর পক্ষে বিচিত্র বিরোধে ভরা রবীন্দ্রজীবনের

গোটা ব্যাপারটা ধারণা করা শক্তই ছিল। আমার কাছেও এর সমস্ত মহিমা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল আরো কিছু পরে।

কয়েক বছর আগে, কবির প্রাক্তন সচিব এল্‌ম্‌হার্স্টের সঙ্গে কদিন কাটিয়েছিলাম ডার্টিংটন হলে। ওঁর কাছে লেখা কবির কয়েকখানি চিঠি উনি দেখালেন। তার থেকে অল্পস্বল্প প্রকাশ করার অনুমতি পেয়েছি। সেই-যে নদীর ধারে উইলো গাছের নিচে আমরা বসতাম, অথবা প্লাতা নদীর রঙবদল দেখে নিতাম দু'চোখ ভ'রে, সেই পুরোনো দিনে এ-চিঠিগুলি হয়তো এমনভাবে জড়িয়ে ধরত না আমাকে। তখন সেগুলি পড়লে হয়তো এই ১৯৫৬ সালের মতোই শিউরে উঠতাম না। কয়েক টুকরো এখানে বলি :

'অত্যাচারে জর্জরিত হওয়া তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু একটা সমগ্র যুগ যদি ভেসে যায় মিথ্যে আদর্শে, ঠ'কে যায়, তার চেয়ে অবমাননার কিছু নেই।'

'সময়ে সময়ে ইতিহাস মানুষকে নিয়ে খেলা করে। কোনো কোনো আচম্‌কা ঘটনার যোগাযোগে একান্ত ছোটো মানুষকেও সে মস্ত ক'রে দেখায়, নকল মহাপুরুষ বানিয়ে তোলে তাকে। এসব মানুষের যে অসাধারণ শক্তি আছে তা নয়, আসলে যাদের এরা চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় তাদেরই এক অসাধারণ দুর্বলতা এর থেকে ধরা পড়ে।'

অনেক অভিজ্ঞতা পেরিয়ে এসে আজ এই কথাটা পুরো বুঝতে পারি। মনে হয় এ যেন আমারই কথা। এখন আর আমি সেই ভ'রে-ওঠা উইলো গাছের ছায়াতে ব'সে নেই। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখছি ঘন সবুজ ইউ গাছের সারি, দীর্ঘ বিলিতি বাগান জুড়ে যেন সান্ত্রীর মতো দাঁড়ানো। নভেম্বর চলছে, ঠিক এই সময়ে গুরুদেব, এল্‌ম্‌হার্স্ট আর আমি একসঙ্গে ছিলাম সান ইসিদ্রোতে। কিন্তু

আজ তিরিশ বছর পর ডেভনশায়ারে মিলেছি কবির দুই বন্ধু, কেবল তিনি নেই। আমাদের সেই নভেম্বর ছিল উষ্ণ বসন্তের মতো, আর বিলেতে এটা ঠাণ্ডা মেঘলা সময়, জানিয়ে দিচ্ছে শীতের আসন্ন আবির্ভাব। তাহলেও, কুয়াশামাখা এই ঝিরঝিরে বৃষ্টিভরা হেমন্ত আমার বিশেষ ক'রেই ভালো লাগছিল। যে বিষণ্ণ সত্যের উচ্চারণ এইমাত্র শুনলাম, তা সত্ত্বেও ভারাক্রান্ত লাগছিল না। বিষাদ ছিল সেদিন, যেদিন আমার হাতে সঞ্চিত ছিল যৌবনের সম্পদ, নিজেরই সম্পদের ভারে যখন অসাড় ছিল সেই হাত। বিষাদ ছিল, যখন 'গীতাঞ্জলি' প'ড়ে কান্নায় ভ'রে উঠেছিল চোখ। ভাষায় ঠিক বলা যায় না কেন বা কীভাবে আমার নিয়ন্তা (এ ছাড়া আর কী তাঁকে বলা যায়) আমার জীবনের এক নিহিত তাৎপর্যকে পূর্ণতা দেবার জন্য কত বাধা বিরোধ আর ভয়াবহ বাঁক পেরিয়ে নিয়ে চলেছেন আমাকে।[২৪] অবশ্য আমি জানি যে যদিও জীবনের অভিপ্রায় বুঝে নেবার কোনো সামর্থ্য আমার নেই, তাহলেও হতাশা আর বিষণ্ণতার বাইরে এ জীবনের একটা মানে আছে। আর এই উপলব্ধির জন্য যে দুজন মানুষের কাছে আমি ঋণী, তাঁরা দুজনেই দূর দেশের মানুষ, ভিন্ন জাতির ভিন্ন সভ্যতার মানুষ : মহাত্মা আর গুরুদেব, গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথ।

আমার এই স্মৃতির দলিলকে রবীন্দ্রনাথ হয়তো নাম দিতেন 'উপলব্ধির উচ্চারণ।' একটি অশ্রুবিন্দুকে অথবা একটি হাস্যরেখাকে কবিতায় রূপ দেবার কোনো যোগ্যতা যদি আমার থাকত, তাহলে হয়তো কবিতা হিসেবেই লিখতাম এটা। কিন্তু সে যোগ্যতা নেই আমার। চোখের জল চোখেই রয়ে যায়, ঠোঁটেই মিলিয়ে যায় ঠোঁটের হাসি।

অকূল কোনো সাগর বা নদী বা সমতলের একেবারে শেষ সীমায় যদি কেউ এসে দাঁড়ান, মনে হবে তিনি যেন কোনো সীমানাহীন ভুবনের প্রান্ত ছুঁয়ে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন অনির্বচনীয় শাশ্বতীর তটে। শরীরবন্ধন ছাড়া আর কিছুই সেখানে আমাদের বেঁধে রাখতে পারে না। ভালোবাসাও আমাদের হৃদয়ে তেমনি এক বিস্তার, তেমনি এক অসীমতার সঞ্চার করে। আর চোখের চেয়ে অনেক বড়ো হৃদয়ের শক্তি।

স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে জীবনে একটা সময় এসেছিল যখন 'সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা' দূর হয়ে গেল।[২৫] সীমার মধ্য দিয়ে অসীমে পৌঁছবার আনন্দ তখনই দেখা দেয়, যখন এদের মধ্যবর্তী শূন্য গহ্বর ভ'রে ওঠে ভালোবাসায়।

এ কথাই বলতে চেয়েছিলেন ব্লেক, যখন তিনি লেখেন: 'পৃথিবীর সমস্তই ঈশ্বরের বাণী'।[২৬] ব্লেকের রচনাবলির ভূমিকায় ইয়েট্স বুঝিয়েছেন যে, সৃষ্টির যতটা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর তার মধ্যে আছে কেবল শয়তানের হাত; বাকি যে অংশটাকে ধরা যায় আত্মার বোধে, সেইটেই একমাত্র সত্য।[২৭] সেই সত্যেরই ঘোষণা দেখি উপনিষদে। যে মুহূর্তে বুঝতে পারি যে সীমার মিথ্যে তুচ্ছতা আর অসীমের মিথ্যে শূন্যতা একই রকম ভুল, কেবল তখনই জানা যায় যে পৃথিবীর সমস্তই ঈশ্বরের বাণী।

ব্লেক বিশ্বাস করতেন যে স্বাভাবিক ঘটনাগুলি হলো প্রতীক মাত্র,[২৮] সে বহন ক'রে আনছে এক অজ্ঞাত জগতের বার্তা। একই রকম ভাবতেন নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু বড়ো সহজ নয় এ বার্তা শুনতে পাওয়া।

আমার মধ্যে একদিন যে সম্পদ লুকোনো ছিল, অথচ যার কথা কিছুই আমি জানতাম না, তাকে ফিরে পেয়েছি রবীন্দ্রনাথ আর

pathagar.net

গান্ধীর হাতে, তাঁদের কাছে এই আমার সবচেয়ে বড়ো ঋণ। যে-দুয়ার রুদ্ধ থাকলে সত্যের থেকে আমরা ছিন্ন হই, এঁরা দুজনে মিলে আমার কাছে খুলে দিয়েছিলেন সেই দুয়ার। ব্লেক লিখেছেন : 'যদি মার্জিত হয় ইন্দ্রিয়ের দ্বার, তবেই মানুষ সব কিছুকে দেখতে পাবে তার স্বরূপে, তার অসীমতায়।'[২৯]

একটিই শুধু ইতিহাস আছে, আত্মার ইতিহাস।[৩০]

সান ইসিদ্রো
জুন-জুলাই ১৯৫৮

pathagar.net

pathagar.net

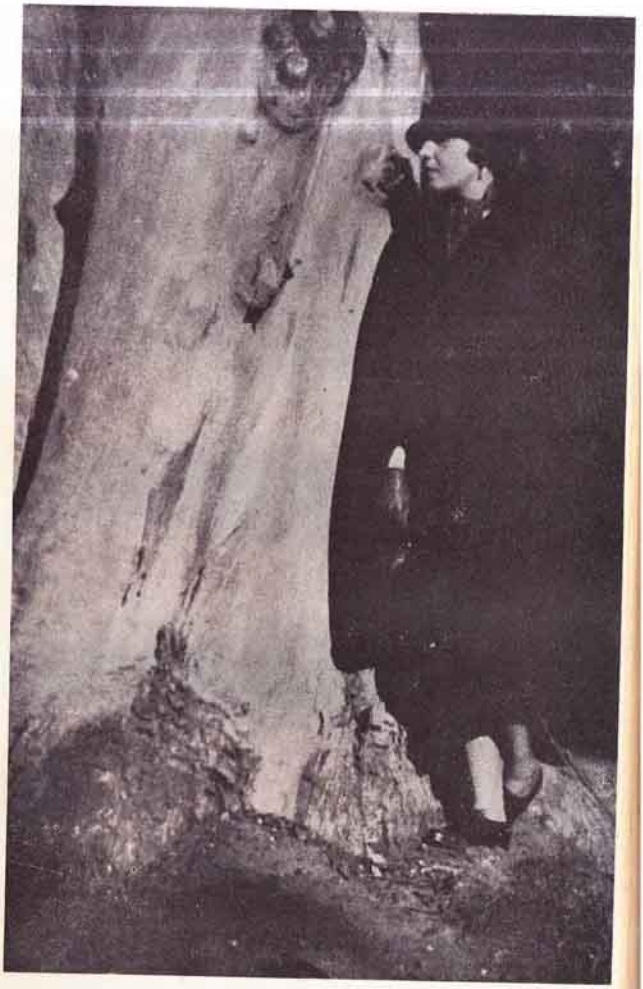

Paris
23-2-39

31, RUE RAYNOUARD, XVI:
AUTEUIL 90-53

Dear, dear Rabindranath,

The ache of homesickness is in me too and has been in me since you left San Isidro, 15 years ago (how very long it seems, how unreally long ago). Those days in "Miralrio" are some of the happiest I have ever known. And I can't go near that house or in that garden without being stabbed by that remembrance and by the "never more", it brings within it its sweetness

pathagar.net

অনুষঙ্গ

pathagar.net

ভিক্টোরিয়া প্রসঙ্গে

১

বুয়েনস আইরেসের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মেছিলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, ১৮৯১ সালে। ছোটোবেলায় ইনি শিক্ষা পেয়েছেন ফরাসি আর ইংরেজ দুই মহিলার কাছে, ইওরোপ যাবার সুযোগ পেয়েছেন কয়েকবার, বড়ো হয়ে মন দিয়েছেন সাহিত্যচর্চায়। দেশের শিল্প আর সাহিত্যের সঙ্গে পরিবারটির নানারকম বন্ধন, ভিক্টোরিয়ার ছোটো বোন সিলভিনাও আর্জেন্টিনার এক নামী কবি। ভিক্টোরিয়া নিজে ফরাসি আর ইংরেজি সাহিত্য থেকে অনুবাদ করেছেন অনেক, তাঁর অনূদিত লেখকের তালিকায় আছেন কাম্যু বা টি. ই. লরেন্স, ফকনার বা ডিলান টমাস, গ্রাহাম গ্রীন বা জন অস্‌বোর্ন।[১] কোনো কোনো বই লিখেছেন সরাসরি ফরাসি ভাষায়। বই আছে তাঁর আঠারোটি।[২] ১৯৩৬ সালে আর্জেন্টিনায় পি. ই. এন্‌-এর সভায় তিনি ছিলেন সহ-সভানেত্রী। Fondo Nacional de las Artes-এর তিনি পরিচালিকা, বুয়েনস আইরেসের প্রসিদ্ধ সাহিত্যপত্র *Sur*-এর তিনি সম্পাদিকা। ১৯৩১ সালে এই পত্রিকার সূচনা করেছিলেন ভিক্টোরিয়া নিজেই। ১৯৩৬-এ তিনি স্থাপন করেন আর্জেন্টিনা মহিলাসমিতি। Sociedad Argentina de Escritoros থেকে স্বর্ণপদক পান তিনি; ১৯৬৭ সালে বিশ্বভারতী তাঁকে উপাধি দেন 'দেশিকোত্তম'।

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সজীব মনের কৌতূহল ব্যাপ্ত হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ থেকে 'আরবের লরেন্স' পর্যন্ত। হয়তো এঁদের মধ্যে কোনো নিভৃত সাযুজ্য ক'রে নিতে জানেন তিনি। Thomas Edward Lawrence (1888-1935)-এর ভাই লিখেছেন[৩], ভিক্টোরিয়া তাঁর সহোদরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন হয়তো এই কারণে যে পার্থিব সম্পদে উদাসীনতাই তাঁর মন টানত খুব, যে-কারণে তিনি ভালোবাসতে পেরেছিলেন গান্ধীকেও। লরেন্স আর ভিক্টোরিয়ার মিল ছিল এই যে দুজনেই ভালোবাসেন পড়তে, বই যেন পুজো

pathagar.net

করেন প্রায়, মুক্ত জীবনের জন্য তীব্র বাসনা দুজনেরই, আর তার সঙ্গে আছে হৃদয়ের উদার আতিথ্য, অপরিমাণ তেজ আর উদ্দীপনা। ঠিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক যে লরেন্সের *Seven Pillars of Wisdom* (1926)-এর কথা বলতে গিয়ে ভিক্টোরিয়াকে নিশ্চিত রূপেই পৌঁছতে হয় রবীন্দ্রনাথের কথায়, বলতে হয়[৪] : 'দৃষ্টিভঙ্গি যদিও ভিন্ন, তাহলেও মনে পড়ে গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি, যেখানে স্রষ্টা আর সৃষ্টি মিলে আছে এক অনির্বচনীয় বন্ধনে।...আমাদের সমকালীন অন্যান্য লেখকের মতোই লরেন্সেরও অভিধান থেকে ঈশ্বর একেবারে নির্বাসিত বটে, কিন্তু তবু এইসব লেখকের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই মানবসমস্যা আর বিশ্বরহস্য বিষয়ে প্রায়-যেন কোনো ধর্মীয় উপলব্ধি।' বস্তুত, এই উপলব্ধিই ভিক্টোরিয়ার একটি বড়ো আশ্রয়। এই উপলব্ধিতে তিনি মিলিয়ে নিতে পারেন লরেন্সের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ।

338. 171 T. E (1942) বইটির ভূমিকায় লরেন্সের ভাই লিখছেন : ওঁর লেখা যে ভিক্টোরিয়া কেবল পড়েছিলেন তা নয়, ওঁকে বুঝবার জন্য যাকিছু প্রাসঙ্গিক তার সবটুকুই তিনি ধ'রে রেখেছিলেন স্মৃতিতে। টুকরো টুকরো নানা তথ্যকে প্রায় গণকযন্ত্রের নৈপুণ্যে জুড়ে নিয়েছিলেন তিনি। উপরন্তু, তাঁর এ বইটিতে দেখি এক স্বতন্ত্র ধরনের মানবিক অন্তর্দৃষ্টি, সত্যিকারের আবেগ থেকে পাওয়া যায় যে দৃষ্টি। সমান স্বচ্ছতায় তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ওঁর গুণ ওঁর দোষ, সফলতা আর ব্যর্থতা, প্রজ্ঞা আর ছেলেমানুষি—কিন্তু সব জড়িয়ে এই দেখায় ওঁর প্রতি তাঁর আকর্ষণ কিছুমাত্র কমে নি। সত্যি বলতে কী, তিনি ওঁকে ভালোবেসেছিলেন।

এ কি লরেন্স বিষয়ে কথা? না কি ভিক্টোরিয়ার রবীন্দ্রপ্রাসঙ্গিক বইটিরই বিষয়ে? সেই একই নিবিড় পাঠ, তুচ্ছতমের স্মৃতি, ভিন্ন ভিন্ন টুকরোকে গ্রথিত করবার সেই একই আশ্চর্য নৈপুণ্য, সেই অন্তর্দৃষ্টি আর আবেগ; সমান স্বচ্ছতায় গুণপনা আর স্খলনকে বিচার করবার সামর্থ্য, আর সবশেষে—কিংবা সবচেয়ে প্রথমে—সেই একই ভালোবাসা : পাতায় পাতায় এরই চিহ্ন নিয়ে কি আমাদের সামনে এসে পৌঁছয় না ভিক্টোরিয়ার রবীন্দ্রস্মৃতি?

স্বামী-পরিত্যক্ত নিঃসন্তান অশীতিপর এই মহিলা দক্ষিণ আমেরিকার এক

শহরপ্রান্তে সেই রবীন্দ্রস্মৃতি নিয়ে মগ্ন আছেন আজ দীর্ঘকাল। *La Nacion* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ১৯২৪ সালে: 'রবীন্দ্রনাথ পড়বার আনন্দ'।[৫] ১৯২৫-এ Aurigos del Arte-তে তিনি ভাষণ দেন[৬]; 'রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কয়েকটি কথা'। সেই ভাষণে তিনি বলেন যে এই কবির বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর রসবোধে, 'fresh and acid as lemon juice'; সেই ভাষণে তিনি বলেন যে এই কবির দর্শন বুঝে নেওয়া যায় সেণ্ট টমাসের একটিমাত্র কথায়: 'hunger for unity'। ওই সভাতেই তিনি 'গীতাঞ্জলি'র ফরাসি অনুবাদ থেকে আবৃত্তি করেন বেশ কয়েকটি কবিতা, তাঁর নিজেরই মনে হয়েছিল যে এমন আবৃত্তি তিনি আর করেন নি কখনো, কেননা এমন নিবিড়ভাবে তিনি ভালোবাসেন নি আর কোনো কবিতা। তাঁর মনে হচ্ছিল যে 'each of these poems was taking body (as they say in French) in my voice—my voice touched each word with such care and such love!'

১৯৩০ সালে পারীতে রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে যে প্রদর্শনী হলো, তার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করেছিলেন ভিক্টোরিয়া। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর *Sur* পত্রিকায় আবার রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে লেখেন তিনি, বক্তৃতা দেন সভায়।[৭] ১৯৫৮ সালে লেখেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর দীর্ঘতম রচনা। *Sur* পত্রিকার পক্ষ থেকে সেই-লেখা বই হিসেবে ছাপা হলো ১৯৬১ সালের মে মাসে: *Tagore en las barrancas de San Isidro!*[৮]

ভিক্টোরিয়ারই উৎসাহে ১৯৬১ সালে সান ইসিদ্রোর একটি রাস্তার নাম হলো রবীন্দ্রনাথের নামে: 'আদেনিদা তাগোরে'; ডাকবিভাগ থেকে বেরুল তাঁর নামে বিশেষ স্ট্যাম্প।[৯] শতবর্ষ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত ৭ মে-র জনসভায় ভাষণ দিলেন ভিক্টোরিয়া; দুদিন পরে রবীন্দ্রবিষয়ক এক আলোচনাবৃত্তেরও অপরিহার্য একজন কথক রইলেন তিনি।[১০] স্পেনীয় ভাষায় 'ডাকঘরে'র অভিনয় হলো (৩১ মে) তাঁর নিজস্ব অবধানে।[১১]

আর, এই তথ্যপুঞ্জের চারপাশে, আমরা যেন ঘিরে রাখি ভিক্টোরিয়ার নিজেরই

pathagar.net

এই নিভৃত উচ্চারণগুলি, কবিতার মতো, কবির কাছে একটির-পর-একটি চিঠিতে লেখা তাঁর এই সব গুঞ্জন[১২] :

It is my turn now to be homesick ! I am homesick for you since you went away, and I can't find rest.

True, my love hurts me sometimes...but that is only a sign that it is not yet good enough for you.

Why did you go away so soon ? Why are you always in such a hurry ? Why don't you think a little about your health when it is wise to think about it ?...Dear Gurudev, I beg your pardon, but I am inclined to scold you very hard.

The mist of homesickness is in me too and has been in me since you left San Isidro, 15 years ago (how very long it seems, how unreally long ago) ! Those days in 'Miralrio' are some of the happiest I have ever known.

The more my heart gives to you, the more it has to give.

২

ভিক্টোরিয়ার কাছে যখন ছিলেন, আর তার পরেও দীর্ঘকাল, তাঁর প্রসঙ্গে নানা সময়ে নানা কথার উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। সেইসব মন্তব্য এখানে কালপরম্পরায় সংকলিত হলো।

pathagar.net

ক. পেরু যাওয়া তো বন্ধ হবার জো হয়েছিল। কিন্তু পেরুর লোকেরা

ছাড়তে চাচ্চে না, তাই রেলপথ বাদ দিয়ে সমুদ্রপথে যাওয়া ঠিক করেচি। এখানকার একজন মহিলা আমাকে ঘরের লোকের মতো যত্ন করচেন—তিনি আমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়েচেন। তিনি তাঁর একটি বাগানবাড়ি আমাদের ছেড়ে দিয়েচেন। তিনি এখানকার খুব একজন বিখ্যাত লেখিকা—অনেকদিন থেকে আমার লেখা পড়ে আমাকে বিশেষ ভক্তি করেন।[১৩]

খ. ভিক্টোরিয়া যদি না থাকত তাহলে ছবি ভালোই হোক মন্দই হোক কারো চোখে পড়ত না। একদিন রথী ভেবেছিল ঘর পেলেই ছবির প্রদর্শনী আপনি ঘটে—অত্যন্ত ভুল। এর কত কাঠখড় আছে যে সে আমাদের পক্ষে অসাধ্য—আন্দ্রের[১৪] পক্ষেও। খরচ কম হয় নি—তিন চারশো পাউণ্ড হবে। ভিক্টোরিয়া অবাধে টাকা ছড়াচ্চে। এখানকার সমস্ত বড়ো বড়ো গুণীজ্ঞানীদের ও জানে—ডাক দিলেই তারা আসে।… ভিক্টোরিয়া ছবি বিক্রির কথা বলছিল—বোধহয় এই উপলক্ষ্যে নিজে কিনে নেবার ইচ্ছে। আমি বলেচি এখন বেচবার কথা বন্ধ থাক।…ভিক্টোরিয়া স্থির করেচে এখানকার একজন বড়ো ডাক্তারকে দিয়ে আমার পরীক্ষা করাবেন।…ভিক্টোরিয়ার আমেরিকা যাবার তাড়া। কেবল আমার এই ছবির জন্যই আছে।[১৫]

গ. জার্মানিতে এবার Dr. Selig এর দ্বারা অনেক উপকার পাব। দেখেছি এসব জায়গায় মেয়ে বন্ধু পেলেই সবচেয়ে কাজে লাগে। প্যারিসে ভিক্টোরিয়া যেরকম ছিল Dr. Seligও সেইরকম, এমন কি, তার চেয়ে বেশি।[১৬]

ঘ. সেদিন বিজয়ার চিঠি পেলুম। ছোট্টো একটি কার্ড লিখেছে, 'যদি তুমি আমায় কিছু লেখো।' একবার আসতে লিখে দিলুম। আমার জন্যে যে কী করবে দিশে পেত না। নিজের বাড়িতে সব-চাইতে সেরা

pathagar.net

সুখসুবিধের মাঝে আমাকে রেখেছিল। অজস্র টাকা আমার জন্যে খরচ করেছে, তাতেও যেন ওর তৃপ্তি নেই। সবসময়ে তবু আশায় থাকত আমি কী চাই। আমার চাওয়া ও প্রাণ দিয়ে মেটাবে এমনি ভাব। ওদের সমাজে ওরা ছিল খুব aristocratic, অনেকটা পর্দার মাঝেই থাকত। ওদের সমান লোক ছাড়া কারো সঙ্গে আলাপ মেলামেশা করত না। মাঝে মাঝে আমি কাউকে কাউকে চা'য়ে ডাকতুম। বিজয়া কখনো ওদের সামনে আসত না। ভিতর থেকে যাতে কোনো অসুবিধে না হয় সব দেখাশুনো করত, কিন্তু কখনো ওদের সঙ্গে আলাপ করত না। আমার তা কেমন যেন লাগত। একদিন এল্‌ম্‌হার্স্টকে বললুম, 'এটা কেমনতরো? লোকজন বাড়িতে আসে অথচ বিজয়া বের হয় না ওদের সামনে, ওরা ভাবে কী, যার বাড়িতে আসে, সেই বের হয় না।'

ঠিক তার পরদিন দেখি বিজয়া এসে দিব্যি হেসে ওদের চা খাওয়াচ্ছে। এতে করে হলো কী, বিজয়া যাদের সামনে বের হয়, তারা পড়ে সংকুচিত হয়ে। তারা যেন জড়সড় হয়ে থাকে। বিজয়া আমার চাওয়ার কাছে ওর সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করত।

বিজয়া খুব শিক্ষিতা মেয়ে ছিল। মাঝে মাঝে আসত, আমার সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ করত। প্রায়ই আমায় বলত, কেন তুমি স্প্যানিশ ভাষা জানলে না, আমি যে সব কথা তোমায় ইংরেজিতে বোঝাতে পারি নে। আমারও দুঃখ হতো খুব, কেন স্প্যানিশ ভাষা শিখি নি কোনোদিন।[১৭]

ঙ. তোমার চিঠিতে বোধ হচ্ছে ভিক্টোরিয়ার উল্লেখ করেছ। তিনি আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন কিন্তু সে সব ব্যয় হয়ে গেছে। অনেক খরচ করে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসবার উপায় করে দিয়েছিলেন—সেই উপলক্ষ্যে প্রচুর অনাবশ্যক ব্যয় করেছেন। প্যারিসে আমার চিত্রপ্রদর্শনীর সমস্ত ব্যয়ভার তিনি নিজে নিয়েছিলেন—তার পরিমাণ অল্প নয়। তিনি আমার জাহাজ-যাত্রার জন্যে যে একটি

আরামকেদারা দিয়েছিলেন সেইটেই কেবল তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সাক্ষ্য-স্বরূপে রয়েছে।[১৮]

চ. সেই স্প্যানিশ মেয়ে বিজয়া, প্রথমেই আমায় বললে যে, আমি তোমার জন্য কী করতে পারি। আমি যখন ওখান থেকে এলুম তখন সে করলে কী, খুব দামী ইটালিয়ান জাহাজে দু-দুটো ক্যাবিন ঠিক করলে আমার জন্যে। আমি বললুম, এর প্রয়োজন কী। কিন্তু সে কিছুতেই মানলে না, বললে, একটাতে তুমি দিনের বেলা কাজ করবে আর একটা ক্যাবিনে রাত্রে শোবে। এর কারণ আর কিছুই নয়—আমার জন্য কিছু করতে চায়, এই ছিল তার আকাঙ্ক্ষা। একটা সোফা সেটা কিছুতেই ঢোকে না ক্যাবিনের দরজা দিয়ে। কাপ্তেনকে বলে দরজা কাটিয়ে বড়ো করে তবে সেই সোফাকে ক্যাবিনে ঢোকালে। বসে বিশ্রাম করব তাতে। তারপর দ্বিতীয়বার যখন আবার যাই বিদেশে তখন সেও য়ুরোপে ছিল। সঙ্গে ছিল সেবার আমার আঁকা ছবিগুলো। সে বললে, আমি এগুলো এ দেশের বড়ো বড়ো ক্রিটিকদের দেখাব। সে দেদার টাকা খরচ করে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করলে ; একজিবিশন করলে, তাও কত খরচ করে। তাই দেখেছি যে, বিদেশি মেয়েরা তাদের ভালোবাসার প্রতিষ্ঠা করে কাজের মধ্যে দিয়ে, ত্যাগের মধ্যে দিয়ে। একরকম ভালোবাসা আছে যা তুলে ধরে, বড়ো করে। আর একরকম ভালোবাসা আছে—আমাদের দেশে, যেটা মারে, চাপা দিয়ে দেয়।[১৯]

৩

দক্ষিণ আমেরিকার দিকে চলেছে আন্দেস জাহাজ। ২৪ অক্টোবর থেকে বেশ কিছুদিনের মতো অসুস্থ বোধ করছেন রবীন্দ্রনাথ। ওই তারিখেই লিখছেন 'ঝড়' আর 'পদধ্বনি' কবিতাদুটি। এই সময়টির প্রসঙ্গে অ্যাণ্ডরুজকে লিখেছেন এক চিঠিতে (২২ ডিসেম্বর ১৯২৪) : 'I suffered so much

pathagar.net

that I thought I was going to die'। 'পদধ্বনি' কবিতায় প্রশ্ন করলেন তিনি 'এ কি বাজে মৃত্যুসিন্ধু পারে?' আর, 'মৃত্যুর আহ্বান' নামেও একটি কবিতা লিখতে হলো ৩ নভেম্বর। এর তিন দিন পর পৌঁছচ্ছেন তিনি বুয়েনস আইরেসে।

আন্দেস জাহাজ থেকে নেমে আসা আর ফিরতি-পথে জুলিয়ো-চেজারে জাহাজে উঠে বসা: অন্তর্বর্তী এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ছাব্বিশটি কবিতা। সান ইসিদ্রোতে ভিক্টোরিয়ার আতিথ্য নেবার আগেই লেখা হয়ে গেছে তার তিনটি। বাকি রচনাগুলির মধ্যে—দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া—বিদেশি এই নারীর অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে অনেকটাই, এ অনুমান অসংগত নয়। জীবনের প্রতি, বসন্তের প্রতি, প্রেমিক স্মৃতির প্রতি তাঁর নবীন আগ্রহ হয়তো একেবারে নিষ্কারণ ছিল না। ১২ নভেম্বর, সান ইসিদ্রোতে পৌঁছবার দিন, 'বিদেশী ফুল' কবিতায় লিখেছিলেন তিনি 'দুই দিন পরে/চলে যাব দেশান্তরে,' আর ফিরবার পথে জুলিয়ো-চেজারে জাহাজের প্রথম কবিতা 'মিলন'এর মধ্যে বলতে হলো 'চলেছি আজ একা ভেসে/কোথা যে কত দূর দেশে!' মনে পড়ছে তাঁর ধরণীর সেই শেষ সীমা যেখানে 'স্বর্গ আসিয়াছে নামি', আর

সেখানে একদিন মিলেছি এসে
কেবল তুমি আর আমি।

এটা ঠিক যে অন্তর্গত এই কবিতাগুলির মধ্যে অনুভব করা যায় এক প্রেমের উদ্দীপন, ভাষার অপরিচয়গত নিরন্তর বেদনা, অথবা স্তবকবন্ধের নূতন পারিপাট্য। এও ঠিক যে 'পূরবী' বইটি উপহার পাঠাবার সময়ে ভিক্টোরিয়াকে লিখেছিলেন (২৯ অক্টোবর ১৯২৫) রবীন্দ্রনাথ: My readers who will understand these poems will never know who my Vijaya is *with whom they are associated*। সাধারণভাবে কবিতাগুলির আস্বাদনে মনে রাখা ভালো এই সান্নিধ্যের কথা, কিন্তু তাহলেও এসব রচনাকে একেবারে আক্ষরিকভাবে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া ঠিক নয়, কবিতাগুলির প্রতি সেটা সুবিচার হবে না। কেবল, দুটিমাত্র কবিতায়

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ করছিলেন ভিক্টোরিয়াকে, সেই দুটিকেই শুধু বলা যায় ওকাম্পো প্রসঙ্গে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতা। সে-দুটি রচনা হলো এই :

ক. প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
মাধুর্যসুধায় ; কত সহজে করিলে আপনারি
দূরদেশী পথিকেরে ; যেমন সহজে সন্ধ্যাকাশে
আমার অজানা তারা স্বর্গ হতে স্থির স্নিগ্ধ হাসে
আমারে করিল অভ্যর্থনা ; নির্জন এ বাতায়নে
একেলা দাঁড়ায়ে যবে চাহিলাম দক্ষিণ-গগনে
ঊর্ধ্ব হতে একতানে এল প্রাণে আলোকেরি বাণী, –
শুনিনু গম্ভীর স্বর, 'তোমারে যে জানি মোরা জানি,
আঁধারের কোল হতে যেদিন কোলেতে নিল ক্ষিতি
মোদের অতিথি তুমি, চিরদিন আলোর অতিথি।'
তেমনি তারার মতো মুখে মোর চাহিলে, কল্যাণী,
কহিলে তেমনি স্বরে, 'তোমারে জানি যে আমি জানি।'
জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি,
'প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি।'[২০]

খ, আরো একবার যদি পারি
খুঁজে দেব সে আসনখানি
যার কোলে রয়েছে বিছানো
বিদেশের আদরের বাণী।

অতীতের পালানো স্বপন
আবার করিবে সেথা ভিড়,
অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে
আরবার রচি দিবে নীড়।

pathagar.net

সুখস্মৃতি ডেকে ডেকে এনে
জাগরণ করিবে মধুর,
যে বাঁশি নীরব হয়ে গেছে
ফিরায়ে আনিবে তার সুর।

বাতায়নে রবে বাহু মেলি
বসন্তের সৌরভের পথে,
মহানিঃশব্দের পদধ্বনি
শোনা যাবে নিশীথজগতে।

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।

ভাষা যার জানা ছিল নাকো,
আঁখি যার কয়েছিল কথা,
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকরুণ তাহারি বারতা।[২১]

৪

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অনেকে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো বিষয়ে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিবৃত করেছেন অনেক সময়ে। তেমন কয়েকটি বিবরণও গৃহীত হলো এখানে।

pathagar.net

ক. প্রতিমা দেবী

বাবামশায় দক্ষিণ আমেরিকার গল্প প্রায়ই করতেন, 'যদিবা ফেরবার জাহাজ পাওয়া গেল কিন্তু ভিক্টোরিয়া আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সাহেবের সঙ্গে তাঁর ছিল একটু রেষারেষির সম্পর্ক, কারণ সাহেব সর্বদা আমার কাছাকাছি থাকত, সেটা সে সইতে পারত না। অবশেষে সে ভাবলে সাহেব আমাকে নিজের স্বার্থের জন্য এত তাড়াতাড়ি ইংলণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে ; গেল সাহেবের উপর খাপ্পা হয়ে। স্প্যানিশরা ভাবপ্রবণ জাত, ওদের সামলানো বড়ো কঠিন, তবে এই জাতই আবার পারে আবেগের উদ্দীপনায় আত্মোৎসর্গ করতে। এই বিদেশিনীর মধ্যে দেখেছিলুম সেই অনুরাগের আগুন।' এই মহিলাটি তাঁর জন্য কতদূর ত্যাগ স্বীকার করতে পারতেন তার পরিচয় পরে পাওয়া গিয়েছিল। এদিকে অনেক হাঙ্গামা করে জাহাজ তো ঠিক হলো, ভিক্টোরিয়া cabin de luxe রিজার্ভ করে দিলেন পাছে বাবামশায়ের সমুদ্রপথে কোনো কষ্ট বা অসুবিধে হয়। তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হতে না পেরে তাঁর নিজের ড্রইংরুমের একখানি আরামচেয়ার জাহাজে তুলে দিলেন, এই নিয়ে জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে তাঁর আরেকবার তর্ক লাগল। কিন্তু ভিক্টোরিয়াকে কেউ পেরে উঠত না। অত বড়ো চেয়ার জাহাজের দরজায় প্রবেশ করবে না, এই ছিল ক্যাপটেনের আপত্তি, কিন্তু শেষকালে ম্যাডামেরই জয় হলো। মিস্ত্রি ডাকিয়ে দরজা খুলে সেই চেয়ার ক্যাবিনে দেওয়া হলো।

সেই চৌকিখানি সেবার নানা দেশ ঘুরে অবশেষে উত্তরায়ণে পৌঁছেছিল। অনেকদিন আর তিনি ওই চৌকি ব্যবহার করেননি, আমাদের কাছেই পড়েছিল। আজ আবার ব্যামোর মধ্যে দেখলুম ওই চৌকিখানিতে বসা তিনি পছন্দ করছেন, সমস্ত দিনই প্রায় ঘুম বা বিশ্রামান্তে ওই আসনের উপর বসে থাকতেন। কোনো একদিন ওই চেয়ারায় বসে তাঁর বিদেশিনী ভক্তের কথা মনে পড়েছিল, তাই লিখেছেন :

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিব বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।

ভাষা যার জানা ছিল নাকো
আঁখি যার কয়েছিল কথা
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকরুণ তাহারি বারতা॥

ভিক্টোরিয়া ইংরেজি খুব ভাঙা ভাঙা বলতেন, ফরাসি ভাষাতেই তাঁর দক্ষতা ছিল বেশি, তাঁকে সুন্দরী বলা চলে না। কিন্তু বুদ্ধির প্রখরতা তাঁর মুখে একটি সৌন্দর্যের দীপ্তি এনে দিত। তাঁর বড়ো বড়ো গাঢ় পল্লব ঢাকা গাঢ় নীল চোখে একটি স্বপ্নময় আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল। তাঁর দীর্ঘ দেহ গৌরবময় আভিজাত্যের পরিচয় দিত। তিনি যখন নতজানু হয়ে বাবামশায়ের পায়ের কাছে বসতেন, মনে হতো ক্রাইস্টের পুরোনো কোনো ছবির পদতলে তাঁর হিব্রু ভক্ত মহিলার নিবেদন-মূর্তি। ইনি দক্ষিণ আমেরিকার একজন স্বনামধন্য প্রভাবপূর্ণ মহিলা।[২২]

খ. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর একজন স্মরণীয় ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে এই প্যারিস শহরে, তিনি হলেন সেনিওরা ভিত্তোরিয়া ওকাম্পো। অবশ্য এই সাক্ষাৎকার ১৯২০ সালে হয়নি, হয়েছিল আর ছ বছর পরে।[২৩] কবি, লেখিকা ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি তাঁর স্বদেশ আর্জেন্টিনায় সুপরিচিত ছিলেন। সুদূর প্যারিসে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, কারণ তিনি প্রায়ই প্যারিসে বেড়াতে আসতেন। তাঁর আভিজাত আচার ব্যবহার এবং তাঁর মধুর স্বভাবের জন্য অনেকেই আকৃষ্ট হতেন। তিনি যখন

আসতেন, লৌকিকতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সোজা চলে যেতেন বাবার কাছে। বাবার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল গভীর – এত স্নেহ করতেন যে বাবার তুচ্ছতম খেয়ালটুকু মেটাবার জন্য হেন কাজ ছিল না যা তিনি করতে না পারতেন। তাঁর রাজোচিত স্বভাবের জন্য মাঝে মাঝে জটিল সমস্যাও দেখা দিত। ১৯২৪-এ পেরু কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে বাবা যখন পেরুর স্বাধীনতার শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছেন, তখন সেনিওরা ওকাম্পোর নির্বন্ধাতিশয়ে পেরু ভ্রমণ বাতিল করে দিতে হয়। তাঁর ধারণা হয়েছিল অসুস্থ শরীরে আন্দিস পর্বত পেরিয়ে পেরু অভিযানের কষ্ট বাবার সহ্য হবে না। তাঁর বিধানমতো বাবাকে আশ্রয় নিতে হলো বুয়েনোস এয়ারেসের উপকণ্ঠে অবস্থিত সেনিওরার পল্লীনিবাসে। পরে অবশ্য জানা গেল, বাবার অসুস্থতা নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কিন্তু তা হলে কী হয়, পেরুর আমন্ত্রণ রক্ষা না করার দরুন আর্জেন্টিনা ও পেরুতে সে-যাত্রা দস্তুর-মতো রাজনৈতিক মন কষাকষি ঘটেছিল। বাবা একটু সুস্থ হয়ে উঠলে রোজ যে চেয়ারে বসতেন সেটি তাঁর বেশ প্রিয় হয়ে উঠল। ইওরোপে বাবার ফেরার সময় আসন্ন; দু চারদিনের মধ্যে জাহাজ বুয়েনোস এয়ারেস বন্দর ছাড়বে। সেনিওরা স্থির করলেন বাবার জন্য জাহাজের যে দুটি ক্যাবিন নির্দিষ্ট হয়েছে সে দুটি তিনি নিজের হাতে সাজিয়ে দেবেন। সে তো না হয় হলো, কিন্তু তিনি যখন বললেন বাবার সেই প্রিয় চেয়ারটি সঙ্গে যাবে, জাহাজ কোম্পানির কর্তারা বেঁকে বসল, কারণ ক্যাবিনের দরজা দিয়ে সে চেয়ার ঢোকানো অসম্ভব। সেনিওরা জানতেন কী করে মানুষকে বশে এনে আজ্ঞাবহ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত কব্জা খুলিয়ে ক্যাবিনের দরজা ঘুরিয়ে, চেয়ারটিকে যথাস্থানে বসিয়ে তিনি শান্ত হয়েছিলেন। সে-চেয়ারটি বাবার প্রতি 'বিজয়া'র (সেনিওরা ভিত্তোরিয়াকে বাবা এই নামে ডাকতেন) প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ এখনো শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। ১৯৩০-এ বাবা আবার যখন প্যারিসে যান, সঙ্গে ছিল তাঁর আঁকা ছবি। ছবি দেখে কয়েকজন ফরাসি শিল্পী বাবাকে একটা চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা

Pathagar.net

করতে অনুরোধ করলেন। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, চট করে প্যারিস শহরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা অসম্ভব বললেই হয়। মোটামুটি পছন্দসই একটা হল্ পেতে হলে বছরখানেক আগের থেকে চেষ্টাচরিত্র করতে হয়। বাবা সেনিওরা ওকাম্পোকে তার যোগে অনুরোধ জানালেন তিনি এসে যেন বাবার সহায় হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলে এলেন এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো যেন বিনা আয়াসেই প্রদর্শনীর সবরকম ব্যবস্থা তাঁর সাহায্যে হয়ে গেল। 'তেয়াত্র্ পিগাল' গ্যালারিটি পাওয়া গেল, যথাসময়ে কাগজে কাগজে প্রদর্শনী বিষয়ে প্রচার শুরু হলো। অল্প কয়েকদিন পরেই বাবার জন্মদিনের কাছাকাছি একটা দিনে [২৪] প্রদর্শনী খোলা হলো। আমাদের ফরাসি বন্ধুরা প্রথম প্রথম তো বিশ্বাসই করতে চাননি যে এত অল্প কয়েকদিনের চেষ্টায় প্যারিস শহরে এরকম একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে।[২৫]

গ. শ্রীমতী কাইজারলিং

ভালোবাসাই ওকাম্পোর প্রতিভা ছিল। গুণী মানুষকে ভালোবাসতে গিয়ে ব্যক্তিগত মণ্ডলবলয় তৈরি করতে পারতেন। তাই তাঁকে বহিরাশ্রয়ী (extrovert) বলা ঠিক হবে না। রবীন্দ্রনাথই তাঁর একমাত্র প্রেম ছিলেন না। তার মানে এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ভালোবাসায় এতটুকু খাদ ছিল। ধীমন্ত, অথচ মনোরম্য ব্যক্তিত্ব। এই সমন্বয় একালে দুর্লভ।[২৬]

ঘ. কাউন্ট কাইজারলিং

ক্ষুদ্রতার এত অভাব আর-কোনো নারীতেই আমি দেখি নি। যা বলতে চাই একটি উদাহরণেই সে কথা স্পষ্ট হবে। এক সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলেন। এম্‌নিতেই তো রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জাগতিক সংসারে একেবারে পরবাসী মানুষ, সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে অনির্ণেয়। স্বভাবই ছিল ওঁর একে-ওকে বিশ্বাস করে বসা। একবার

Pathagar.net

ভারতবর্ষে পেরু সরকারের প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে এক ঠক ওঁকে আমন্ত্রণ জানাতেই রাজি হয়ে বসলেন।[২৭] ইংকার স্পেনবিরোধী চেতনার একটি স্মারক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে, লোকটির এই আবদার মেনে আচম্‌কা রওনা হয়ে গেলেন বুয়েনস আইরেসে, প্রায় নিষ্কপর্দক অবস্থায়। কবি ভেবেছিলেন ঐ শহর লিমারই নগরপ্রান্তে। পৌঁছে দেখেন কেউ তাঁকে নিতে আসে নি। বিমূঢ় বাক্যহত, অসহায় কবি সবকিছুতেই তখন বিরক্ত। বন্দরের কোলে একটি ছোট্ট পান্থনিবাসে নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন। সেখানে তাঁকে আবিষ্কার করলেন এই মহিলা, তৎক্ষণাৎ সুন্দর নিসর্গ-পরিবেশে একটি ছোট্ট বাসায় নিয়ে এলেন। সান ইসিদ্রোর এই ভবন ওঁরি জন্য বিশেষ করে তিনি সাজিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর হাতে তখন যৎসামান্যই অর্থ। এই ব্যাপার তাঁর জীবনে ঘটেছে চিরদিন, অবারিত দাক্ষিণ্যবশে যাঁর দ্বারা যখন আকৃষ্ট বোধ করেছেন তখুনি তাঁর জন্যে নিজের সমস্ত-কিছু বিলিয়ে সর্বরিক্ত হয়ে গেছেন এই নারী। যা ছিল তাঁর, সব দিয়ে ফেলেছেন। অশেষ বিত্তশালিনী হয়েও আর্থিক অনটনে এভাবে সবসময়ে অসুবিধেয় পড়েছেন। এ রকম অবস্থা থেকে প্রায়ই দুর্জ্ঞেয় দৈববলে তাঁকে উদ্ধার করত তাঁর সংসারের দুটি কাজের লোক—হোসে আর ফানি[২৮]—এরা দুজনেই ওঁকে দেবীর মতো ভক্তি করত। সে সময়ে ভিক্টোরিয়া নির্ভাবনায় ওঁর যাবতীয় অলংকাররাশি বিকিয়ে দিয়েছিলেন আর বিক্রয়লব্ধ সেই অর্থে মাসের পর মাস কবির দেখাশোনা করেছিলেন।[২৯]

ঙ. কাউন্ট কাইজারলিং

I have come across very few great women, because those who could have developed into such had remained in this transition period in an embryonic state—whether in this feminine or any other form. In recent years, however, I have come in contact with one woman whose superlative

pathagar.net

eminence is beyond question, namely, the Argentinian, Victoria Ocampo. A wonderfully beautiful woman of great vitality, acute intelligence, fine aesthetic feeling, enormous power of work and great social position.[৩০] Her picture has inspired many, very many views of 'South American Meditations'. In South America there has arisen a new womanhood, based partly upon the traditional Spanish or Roman, and partly upon the positive acquisitions of North America and so far lying historically beyond the range of many European problems.[৩১]

There are many people whose women are in a typical sense more important than the men ; this is true in a high drgree of South American people. Here I can only read the signs. But the experience of South America constitutes in all respects the most important experience of my whole life. There for the first time the soul element in man comes most into prominence. Besides I have been able to work, as I have seldom done for anything else, for the awakening of a new culture.

The person, however, who has helped me most in all this is Victoria Ocampo who with her striking personality exercised great influence in the southern world, as very few woman in the old world have been able to do.[৩২]

pathagar.net

৮. শ্রী কৃষ্ণ কৃপালনী

More than a decade after Tagore's death in 1941, my wife and I had the good fortune of meeting Victoria Ocampo in Paris. We were immediately struck by the extraordinary charms of her personality, her intellectual vitality and her spiritual sensibility—a combination which is, alas! too rare in this world.

We had hoped to see her again last November, this time in our country. She had been invited to participate in an International Literary Seminar which the Sahitya Akademi had organised in Delhi in honour of the Tagore Centenary. Many distinguished delegates had gathered from all over the world, among them Aldous Huxley. Victoria Ocampo's presence among them would have added to the brilliance of this galaxy. Everyone would have loved to meet her and hear her speak, for she would have been among all the delegates the one most closely associated with Tagore. But it was not to be. She was obliged to cancel her visit for reasons of health. It was a great disappointment to all……

She is one of those who belong to the world. 'I greatly admire Madame Victoria Ocampo' wrote the Prime Minister Jawaharlal Nehru to the present writer recently. These simple words of the greatest of contemporary Indians voice with noble humility the sentiment of Tagore's India.[৩৩]

pathagar.net

৫

এসবের বাইরেও ভিক্টোরিয়া-রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আলোচনা বা মন্তব্য পাওয়া যায় কোনো কোনো রচনায়।[৩৪] এ নিয়ে অল্পবিস্তর লিখেছেন শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রসাহিত্য -প্রবেশক, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৫২), শ্রীশিবনারায়ণ রায় (সাহিত্যচিন্তা, –), শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য (কবিমানসী, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬২, ১৯৭১), শ্রীহায়াৎ মামুদ (মৃত্যুচিন্তা রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জটিলতা, ১৯৬৮), শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত (রবীন্দ্রসম্ভব কাব্য, ১৯৭২); শ্রীশিবদাস ব্যানার্জী ('When East and West Met,' *Hindusthan Standard*, 1965 July 9), শ্রীশিবানী চট্টোপাধ্যায় ('ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৬৭), শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য ('Upacharya's Address at the Convocation', *Visvabharati News*, January 1968), শ্রীজ্যোতির্ময় মৌলিক ('বিজয়ার করকমলে', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ মে ১৯৭০)। এর অধিকাংশ লেখার প্রধান লক্ষ্য রবীন্দ্রবিচার, কেবল শেষোক্ত রচনাটিতে পাওয়া যাবে ওকাম্পোর সঙ্গে লেখকের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কিছু স্মৃতি।

---

১. Albert Camus (1913-60), Thomas Edward Lawrence (1888-1935), William Faulkner (1897-1962), Dylan Thomas (1914-53), Graham Greene (1904), John Osborne (1929).

২. ভিক্টোরিয়ার লেখা বইকটির নাম : *De Francesca a Beatrice* 1924, *La Laguna de los nenufares* 1926, *Testimonios I-VI* 1935-47, *Domingos en Hyde Park* 1936, *San Isidro* 1941, *338. 171 T. E* 1942, *Soledad Sonora* 1950 *El Viajero y una de sus sombras* 1951, *Lawrence of Arabia y otros ensayos* 1951, *Virginia Woolf en su diario* 1954, *Habla el algarrobo* 1959, *Tagore en las*

barrancas de San Isidro 1961. *Antologia de Jawaharlal Nehru : Seleccion y Prologo* 1966.

৩ Victoria Ocampo, *338. 171 T.E*, tr, David Garnett, London, 1963, pp. 14-15.

৪ *Ibid*, p. 77.

৫ এই বইয়ের পৃ ৩৭ দ্রষ্টব্য।

৬ ১৯২৫ সালের ২৮ ডিসেম্বরে রবীন্দ্রনাথকে লেখা ভিক্টোরিয়ার চিঠি থেকে। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত।

৭ ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চে রবীন্দ্রনাথকে লেখা ভিক্টোরিয়ার চিঠি থেকে। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত।

৮ ইংরেজি অনুবাদে এই লেখার প্রাথমিক একটি ছোটো অংশ দেখা গিয়েছিল সাহিত্য অকাদেমীর *Indian Literature* পত্রিকায় (April-Sept. 1959), নাম ছিল 'West meets East : Tagore on the banks of the river Plate'। এই নামেরই দ্বিতীয়াংশ নিয়ে অকাদেমী প্রকাশিত শতবার্ষিক সংগ্রহে ছাপা হয়েছিল লেখাটির দীর্ঘতর অংশ। বইটির সম্পূর্ণ ইংরেজি অনুবাদ এখনো পর্যন্ত কোথাও মুদ্রিত হয়নি।

৯ *Tagore Centenary Bulletin*, New Delhi, 1961 September, p. 26.

১০ *Ibid*, p. 27.

১১ *Ibid*, p. 27. ভিক্টোরিয়ার দেখাশোনাতেই যে নাটকটি অভিনীত হয়, এই তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য শ্রীজ্যোতির্ময় মৌলিকের 'বিজয়ার করকমলে', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ মে ১৯৭০।

১২ রবীন্দ্রনাথকে লেখা ভিক্টোরিয়ার বিভিন্ন চিঠি থেকে সংকলিত। চিঠিগুলি আছে রবীন্দ্রসদনে।

১৩ প্রতিমা দেবীকে লিখিত চিঠি, নভেম্বর ১৯২৯। চিঠিপত্র ৩, ১৯৪২, পৃ ৩৪-৩৫।

pathagar.net

১৪ Andre´e Karpele´s-Hogman। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের অনুরাগিণী এই শিল্পী ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন *Fireflies*, *Chitra*, লিপিকা, ছেলেবেলা।

১৫ প্রতিমা দেবীকে লিখিত চিঠি, এপ্রিল ১৯৩০। চিঠিপত্র ৩, ১৯৪২, পৃ ৯৫-৯৭।

১৬ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত চিঠি, ১৫ জুলাই ১৯৩০। চিঠিপত্র ২, ১৩৪৯, পৃ ৯৩।

১৭ শ্রীমতী রানী চন্দকে কথিত, ২৯ জুলাই ১৯৩৪। রানী চন্দ, আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৮, পৃ ৯-১১।

১৮ হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত চিঠি, ১২ আগস্ট ১৯৩৫। চিঠিপত্র ৯, ১৩৭১, পৃ ২৯৭।

১৯ শ্রীমতী রানী চন্দকে কথিত, ২৩ মে ১৯৪১। রানী চন্দ, আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৮, পৃ ১০৯-১০।

২০ 'পূরবী' (১৯২৫) কাব্যের 'অতিথি' কবিতা, ১৫ নভেম্বর ১৯২৪।

২১ 'শেষ লেখা' (১৯৪১) কাব্যের ৫-সংখ্যক কবিতা, ৬ এপ্রিল ১৯৪১।

২২ প্রতিমা দেবী, নির্বাণ, ১৯৪২, পৃ ৬২-৬৪।

২৩ এই উদ্ধৃতি 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে গৃহীত; এই অংশটি শ্রীক্ষিতীশ রায়ের অনুবাদ। মূল ইংরেজিতে (*On the Edges of Time*, 1958, pp. 148-59) রথীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'four years later'। অনুবাদের এই 'ছ বছর পরে' কার সংশোধন, তা অস্পষ্ট। বস্তুত, চার বা ছয় কোনোটিই নির্ভরযোগ্য তথ্য নয়। এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল ১৯২০ সালের দশ বছর পর, ১৯৩০ সালে।

২৪ ২ মে ১৯৩০।

২৫ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতৃস্মৃতি, ১৩৭৮, পৃ ১৯২-৯৪।

২৬ কাউণ্ট কাইজারলিঙের স্ত্রী শ্রীমতী কাইজারলিঙের মৌখিক মন্তব্য। ডার্মস্টাটের কাইজারলিং-স্মৃতিসদনে (Keyserling

pathagar.net

Archiv) শ্রীমতী ট্রুটবার্টা হেসলিঙ্গার এবং শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে কথাসূত্রে বিবৃত,২-৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০। ভাষান্তর : শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

২৭ পেরুতে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে কাউন্ট কাইজারলিঙের এই মন্তব্যটি এ-বিষয়ে প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'খোলা পথের ধারে' অংশের ৩-সংখ্যক সূত্রটি দ্রষ্টব্য।

২৮ Tagore on the Banks of the River Plate রচনায় (*Rabindranath Tagore, A Centenary Volume 1861-1961*, Sahitya Akademi, p. 39) ভিক্টোরিয়া এই ফ্যানির পরিচয় দিয়েছেন : Fani (Estefania Alvarez) was my maid who accompanied me everywhere from my adolescence until her death (for forty years or more). We considered her a member of the family and I was something like a daughter to her,

২৯ Hermann Graf Keyserling, *Reise durch die Zeit*, pt. II, p. 387.

শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের অনুবাদ।

৩০ ভিক্টোরিয়া প্রসঙ্গে কাউন্ট কাইজারলিঙের এই বর্ণনার পাশাপাশি লক্ষ করতে ভালো লাগবে কাইজারলিং বিষয়ে ভিক্টোরিয়ার মন্তব্য। বুয়েনস আইরেস থেকে ১৯২৯ সালের ১৩ জুলাই তিনি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথকে : 'Count Keyserling is lecturing in Buenos Aires just now. He often speaks about you and admires you immensely as you well know. But I have never seen, in my life, a man so *rhythmically* different from you as he is.' রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত চিঠিপত্র থেকে।

৩১ এই প্রসঙ্গে তুলনীয়, 'ভালোবাসা' পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত ভিক্টোরিয়ার চিঠি। দ্রষ্টব্য পৃ ১০০।

৩২ Count Keyserling, *Significant Memories. The Calcutta Municipal Gazette*-এর Tagore Memorial Special Supplement (September 13, 1941)-এ উদ্ধৃত, p. XXXII।

৩৩ Krishna Kripalani, *Faith and Frivolity*, New Delhi, 1962, pp. 91-92.

৩৪ এ-বইটির প্রথম প্রকাশের (১৯৭৩) পরে ভিক্টোরিয়া বিষয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। সেখানে অবশ্য নূতন কোনো তথ্য চোখে পড়ে নি।

pathagar.net

সূত্রাবলি

[বিদেশি নামের ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখের সময় রোমান হরফ ব্যবহার করা হলো। আর, বন্ধনীমধ্যে জন্মমৃত্যুকাল বা বইয়ের প্রকাশকালও দেওয়া হলো কেবল প্রথমবারের উল্লেখে।]

বিজয়ার অলিন্দে

১ 'সোনার তরী' (১৮৯৪) বইটির 'মানসসুন্দরী' কবিতায় আছে :

ভুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে
সখী…

২ 'মানসী' (১৮৯০) কাব্যের 'মেঘদূত' কবিতায় :

লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্য মাঝে একাকী জাগিয়া।

আবার,

সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদীগিরি সকলের শেষে।

৩ 'প্রভাতসংগীতে'র (১৮৮৩) 'প্রতিধ্বনি' কবিতায় :

মাঝে মাঝে কারো মুখে সহসা দেখে সে যেন
অতুল রূপের প্রতিধ্বনি,
কাছে গেলে মিলাইয়া যায়
নিরাশের হাসিটির প্রায়—
সৌন্দর্যের মরীচিকা এ কাহার মায়া
এ কি তোরি ছায়া!

৪ এই প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'র (১৯১২) 'প্রভাতসংগীত' অধ্যায় থেকে

pathagar.net

এই অনুচ্ছেদটি স্মরণীয় : 'এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, এইজন্য তাহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতে একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন্ একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশেকালে ছড়াইয়া পড়িতেছে – এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে।...যে সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাঁধা, আকারে নির্দিষ্ট ; তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য, তাহাই আনন্দ। তাহাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব, তাই সে এমন করিয়া ঘরছাড়া করিয়া দেয়।'

৫ যেমন ভেবেছেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য (১৯১২) তাঁর 'কবিমানসী' (১৯৬২) বইতে।

৬ যেভাবে দেখেছেন শ্রীবুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪)। 'জীবনস্মৃতি'র কবিকৃত মন্তব্য মনে রেখেও 'বিদেশিনী' বিষয়ে তিনি বলছেন— 'এখানে স্বাভাবিক নিয়ম ও কবিপ্রসিদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ করে "পশ্চিমে"র সঙ্গেই "আশা"র সংযোগ ঘটানো হলো। এবং এরই সঙ্গে "বিদেশিনী" শব্দটিকে যুক্ত করে দেখলে প্রতীচীর প্রতি একটি ইঙ্গিতের সম্ভাবনা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।' কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৬), পৃ ৫২।

৭ জীবনস্মৃতি, ১৯৬২, পৃ ১১৪-১৫।

৮ Mario Praz, *The Romantic Agony*, tr. A. Davidson, Fontana Libray, 1960, pp. 285-92.

৯ এ-গানটি লেখা হয়েছিল শিলাইদহে, ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২৫ আশ্বিন (১১ অক্টোবর ১৮৯৫)। সম্পূর্ণ গানটি এই :

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।
তুমি থাকো সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী॥
তোমায় দেখেছি শারদপ্রাতে
তোমায় দেখেছি মাধবীরাতে
তোমায় দেখেছি হৃদিমাঝারে ওগো বিদেশিনী॥
আমি আকাশে পাতিয়া কান
শুনেছি শুনেছি তোমারি গান
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী॥
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
আমি এসেছি নূতন দেশে
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী॥

যখন এ গানটি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, তার সমসময়ে ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীকে (১৮৭৩-১৯৬০) চিঠিতে লিখছিলেন তিনি :

'আমার মনটা এই আলোকে, স্তব্ধতায়, এই নির্মল শুভ্র স্বচ্ছ আকাশে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কে একজন যাদুকরী তার কোমল হস্তে আমার দুই চক্ষে একটি অমৃতময় মোহ মাখিয়ে দিয়ে গেছে, এই মধ্যাহ্নের নিস্তরঙ্গ নদী এবং ও-পারের প্রফুল্ল-কাশবন-শোভিত বালির চর আমার কাছে একটি সুদূর পূর্বস্মৃতির মতো মনোহর লাগছে।' ৪ অক্টোবর ১৮৯৫। 'সমস্ত আকাশ যেন হৃদয়পুঞ্জের মতো আমাকে বেষ্টন করে ধরছে।' ৪ অক্টোবর ১৮৯৫।

'কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিস দেখতে বলছে, কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থিরকর্ণে বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে…' ৫ অক্টোবর ১৮৯৫।

pathagar.net

'এই বিস্তীর্ণ জল এবং নদীতীর থেকে একটি নিশ্বাস আমার গায়ের উপর এসে পড়ছে—একটি অত্যন্ত নিকটবর্তী প্রাণময় প্রীতিময় ভাবময় সঙ্গ আমার অন্তরে বাহিরে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে, তাকে আমি কিছুতেই যেতে বলতে পারছি নে। এই অপর্যাপ্ত জ্যোতির্ময় নীলাকাশ আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন অবনত হয়ে পড়েছে, এই আলোক আমার রক্তের মধ্যে প্রবেশ করেছে···আমি একটি পরিব্যাপ্ত অথচ নিভৃত সৌন্দর্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছি।' ৬ অক্টোবর ১৮৯৫।

'আমার সঙ্গে আর অনন্ত জগৎপ্রাণের সঙ্গে যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণ গন্ধ গীত—চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য অলক্ষ্যভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে—কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে।' ১০ অক্টোবর ১৮৯৫।

আর, এর পরদিনই লেখা হলো ওই গানটি।

এই গানটির দীর্ঘকাল পর আমরা পাই 'নবজাতক' (১৯৪০)-এর 'সন্ধ্যা' কবিতাটি, যার শেষ দুটি লাইন :

দিনশেষে দেখা দেয় সে আমার বিদেশিনী
তারে চিনি তবু নাহি চিনি।

১০ এ-বইয়ের পৃ ৯৭ দ্রষ্টব্য।

১১ যাত্রী, ১৯৪৬, পৃ ১০১-১০২।

১২ রবীন্দ্রনাথের অনেক গান বা কবিতাকে আক্ষরিক ভাবে বুঝে নিতে গেলে যে বিপদ হয়, তার একটা দৃষ্টান্ত আছে 'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে' গানটির লক্ষ্যবিচারে। 'কবিমানসী' বইটির প্রথম খণ্ডে (পৃ ৩৭১) শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন : 'প্যারিসে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের ফলে কবি ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে নূতন কোনো কবিতা লিখেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার প্রসঙ্গে কবির একটি গানের কথা বিশেষ ভাবেই মনে হয়।···আমরা যে গানটির কথা বলছি সেটি লেখা হয় ১৩৩৬ সালে। সেই গানটি হলো : সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে।'

কিন্তু, এই গানটি রচনার প্রসঙ্গ যে ভিন্ন, সেকথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই উল্লেখ করেছেন অন্যত্র, একটু অন্যভাবে : 'তারপরে আজ চলেচি রেলগাড়িতে চড়ে মাদ্রাজের দিকে। একটা ভারি গোছের নীল মলাটওয়ালা বই এনেছিলুম—সে আর খোলা হলো না। জানলার বাইরে আমার দুই চোখের অভিসার আর থামে না। জানলা দিয়ে এই ফাল্গুনের রৌদ্রে যখন একটি অভাবনীয় মাধুরীর মূর্তি দেখি তখন নিশ্চিত জানি সেটা দেখতে দেখতে মিলিয়ে যাবে। মনকে জিজ্ঞাসা করি এই উপলব্ধিটা কি একেবারেই মায়া। মন তো তা স্বীকার করে না। যা দেখচি সে তো একলা আমারই আনন্দের দেখা নয়···যারা এতকাল দেখেচে এবং চিরকাল দেখবে তাদেরই দেখাকে সংগ্রহ করে নিয়ে গেলুম—সেই সঙ্গে একটা কবিতাও লেখা গেল :

সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।···'

'প্রবাসযাত্রীর পত্র' নামে এই লেখাটির তারিখ ২ মার্চ ১৯৩০। বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৩৬, পৃ ৪৫৬-৫৭।

১৩ যাত্রী, ১৯৪৬, পৃ ১১৫।

১৪ 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) বই থেকে ৩৮-সংখ্যক গান।

১৫ চিঠিপত্র ৯, ১৯৬৪, পৃ ১৮৯।

১৬ এর প্রথমটি ১৯১২ সালে লেখা এবং দ্বিতীয়টি ১৯১০ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে গৃহীত।

১৭ রবীন্দ্রজীবনের উত্তরখণ্ডে এইটেকে বলা যায় অন্যতম প্রধান এক দ্বন্দ্ব, এই ছিঁড়ে যাওয়ার বেদনা অসংখ্যবার তিনি জানিয়েছেন তাঁর হিতৈষীদের কাছে। ১৯২০ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তাঁর মনোভাব বুঝবার জন্য বিভিন্ন রচনা থেকে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ এখানে বিন্যস্ত হলো।

'I was born a poet....I am not an athlete. I do not belong to the arena. The stare of the curious crowd

scorches my soul.' 1920 Nov. 30, *Letters to a Friend*, London, 1928, p. 104.

'...This makes me think that it is safe to be nothing better than a mere poet. For poets have to be true to their best moments and not other people's requirements.' 1921 Jan. 8, *Ibid*, p. 114-15.

'Why should I be anything else but a poet ? Was I not born a music-maker ?' 1921 Feb 24, *Ibid*, p. 125.

'Pushing the wheelbarrows of propaganda from continent to continent – is this going to be the climax of a poet's life ? It seems to me like an evil dream from which I occasionally wake up in the dead of night.' 1921 Feb. 24, *Ibid*, p. 126.

'In this modern age of the philosophy of relativity I suppose I cannot claim for myself the quality of absolute poetdom. It is evident that the poet in me changes its features and spontaneously assumes the character of the preacher with the change of its position.' 1921 July 7, *Ibid*, p. 177.

'ক্রমে কখন এক সময়ে আমার জীবনের ক্ষেত্র বহু বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল। সেটা যেন আমার জন্মান্তরের মতো। সেই আমার নবজন্মের জন্মদিন এতদিন ধরে চলে এসেচে। যেটাকে আমার জন্মান্তর বললুম, তাকে আমার পরলোক বলাও চলে।...আবার আমি ফেলে দিয়েছি আমার বই, আমার কাজ। আবার আমার মন পলাতক। সমস্ত দিন কিছুই করিনে কেবল সামনে চেয়ে আছি – দেখি পূর্ণতা সেই শূন্যে।' মে ১৯২৪, চিঠিপত্র ৫, ১৯৪৫, পৃ ৪৮-৫০।

'আমি দার্শনিক নই, তত্ত্বজ্ঞানী নই, prophet নই। দেশবিদেশে খ্যাতি

pathagar.net

হয়েছে বটে, সেজন্য আমি লজ্জিত, আমার কাছে কিছু প্রত্যাশা করবে না। আমি কবি, সেইজন্যে তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে চাচ্ছি, তোমাদের উপর pulpit থেকে জ্ঞানের শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করতে চাইনে…।' জুলাই ১৯২৪, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে মৌখিক ভাষণ, প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩১।

'যদিও আজ চলেচি পশ্চিম সমুদ্রের তীরে, আমার মন খুঁজে বেড়াচ্ছে আর-এক তীরে সকল-কাজভোলা সেই বালকটাকে। পূরবী গানে সে আপন লীলা শেষ করতে না পারলে সন্ধ্যা ব্যর্থ হবে, এখন সে কোথায় ঘুরে মরচে। ফিরে আয়, ফিরে আয় বলে ডাক পড়েচে। একজন কে তার গান শুনতে ভালোবাসে। আকাশের মাঝখানে তার আসন পাতা; সেই তো শিশুকালে তাকে বাঁশির দীক্ষা দিয়েছিল, নিশীথরাতের শেষ রাগিণী বাজানো হলে তারপরে তার বাঁশি ফিরে নেবে। আজ কেবলি সেই কথাই আমার মনে পড়চে।' ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, ভানুসিংহের পত্রাবলী, ১৯৪৫, পৃ ১১৯।

'বর্তমান বয়সে আমার জীবনের প্রধান সংকট এই যে, যদিচ স্বভাবত আমি আরণ্যক তবু আমার কর্মস্থানের কুগ্রহ সকৌতুকে আমাকে সাধারণ্যক করে দাঁড় করিয়েছেন।' ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, যাত্রী, ১৯৪৬, পৃ ১৬।

'কাব্যসরস্বতীর সেবক হয়ে গোলমালে আজ গণপতির দরবারের তকমা পরে বসেছি।' ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, তদেব, পৃ ১৮।

'কেউ বললে নেতা হও, কেউ বললে সভাপতি হও, কেউ বললে উপদেশ দাও, আবার কেউবা বললে, দেশটাকে মাটি করতে বসেছ।…পাকা দেয়ালগুলোই মায়া, পাথরের কেল্লাই কয়েদখানা। মন কাঁদছে, মরবার আগে গাখোলা ছেলের জগতে আর একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্ববিহীন খেলা।' ৫ অক্টোবর ১৯২৪, তদেব, পৃ ৭৪-৭৭।

'প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে তুমি তোমার দূরের বঁধুর উত্তরীয়ের সুগন্ধি হাওয়া পেয়েছিলে। শেষ বয়সের পথে বেরিয়ে গোধূলিরাগের রাঙা

pathagar.net

আলোতে তোমার সেই দূরের বঁধুর সন্ধানে নির্ভয়ে চলে যাও। লোকের ডাকাডাকি শুনো না।' ৭ অক্টোবর ১৯২৪, তদেব, পৃ ৯০।

১৮ 'It is difficult for me to suffer myself to be rudely hustled in my path by busy men who have no leisure for ideas.' *Letters to a Friend*, London, 1928, p. 104.

১৯ 'All about me is a desert of crowds, a monotony of multitudes.' *Ibid*, p. 110.

২০ 'কিছুদিন আগে চীন থেকে আমার কাছে নিমন্ত্রণ এসেছিল। সেখানকার লোকে আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চেয়েছিল—কোনো পাকা কথা। অর্থাৎ, সে নিমন্ত্রণ প্রবীণকে নিমন্ত্রণ।' যাত্রী, ১৯৪৬, পৃ ৬।

২১ রবীন্দ্রনাথের চীনভ্রমণের বিশদ বিবরণ হিসেবে দ্রষ্টব্য Stephen N. Hay রচিত *Asian Ideas of East end West, Tagore and His Critics in Japan, China and India*, Harvard University Press, 1970.

২২ দ্র 'চীন ও জাপানে ভ্রমণ বিবরণ', প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩১, পৃ ৯৮, ৯২।

২৩ এ-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত মন্তব্যগুলির সবকটিই পাওয়া যাবে 'যাত্রী' বইতে। দ্র যাত্রী, ১৯৪৬, পৃ ৬-৭,১৬, ১৮, ৭৬।

২৪ এ-বাক্যের উদ্ধৃতিচিহ্নিত শব্দগুচ্ছটি নেওয়া হয়েছে 'পূরবী' (১৯২৫) কাব্যের 'আহ্বান' কবিতা থেকে। মনে রাখা দরকার যে এ-কবিতা লেখা হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকা-গামী হারুনা-মারু জাহাজে বসে, ১৯২৪ সালের ১ অক্টোবর।

২৫ যাত্রী, ১৯৪৬, পৃ ৬, ৯০।

২৬ ১৯৬৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর বিশ্বভারতী 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেন শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে।

২৭ Pablo Neruda (1904-73)। এই ছদ্মনামে লিখতেন Neftali Ricardo Reyes y Basoalto। উদ্ধৃত এই লাইনটির মূল হলো :

pathagar.net

Tu
me ensenaste
a ser
americano.

২৮ *Alturas de Macchu Picchu* ১৯৫০ সালে প্রকাশিত নেরুদার দীর্ঘ কবিতা।

২৯ Jorge Luis Borges (1899)। দ্র 'The Argentine writer and Tradition,' *Labyrinths*,New York, 1964, pp. 177-85.

৩০ Miguel de Unamuno (1864-1936)। তাঁর জীবনমৃত্যুর দর্শন *Del Sentimiento Tragico de La Vida* ছাপা হয় ১৯১২ সালে।

৩১ Albert Schweitzer (1875-1965) এই মন্তব্য করেন তাঁর *Indian Thought and Its Development* (1936, tr. Mrs C. E. B. Russell) বইটির ২৪৮ পৃষ্ঠায় : 'In Tagore's magnificent thought-symphony the harmonies and modulations are Indian. But the theme reminds us of those of European thought.'

৩২ ১৮৮০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে পরম্পরায় এই আন্দোলনগুলির নাম ছিল Modernismo, Mundonovismo, Sencillismo, Creacionismo, Ultraismo।

৩৩ Baldomero Fernandez Moreno (1886-1950) তাঁর প্রথম বই প্রকাশ করেন ১৯১৫ সালে : *Las Iniciales del Misal*।

৩৪ Juan Ramon Jimenez (1881-1954)।

৩৫ হিমেনেথ-দম্পতি রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে এই বাইশটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন :

১৯১৫ : *La Luna Nueva*

১৯১৭ : *El Fardinero, El Cartero del Rey, Pajaros Perdidos, La Cosecha*

pathagar.net

১৯১৮ : *El Asceta, El Rey y la Reina, Malini, Ofrenda Lyrica, Las Peidras hambrientas I y otros Cuentos, La Piedras hambrientas II y otros Cuentos, Cielo dela Primavera*

১৯১৯ : *El Rey de Salon Oscuro, Sacrificio, Morada de Paz, Regalo del Amante, Chitra, Mashi y otros Cuentos, Transito*

১৯২১ : *La Harmana Mayor y otros Cuentos*

১৯২২ : *La Fugitive I, II*

৩৬ বইটির সম্পূর্ণ নাম *Viente Poemas de Amor y Una Cancion Desesperada* (1924): কুড়িটি প্রেমের কবিতা আর একটি নিরাশার গান।

৩৭ বোর্হেসদের সেই নতুন আন্দোলনের ঘোষণা ছিল এইরকম : আমাদের কবিতার প্রতিটি লাইনের আছে এক নিজস্ব সত্তা, প্রতিটি লাইন প্রকাশ করে এক প্রজ্ঞাদৃষ্টি। আমাদের কবিতা গড়ে তোলে এক আবেগবহ পরিবর্তমান বৈচিত্র্যময় পুরাণ।

৩৮ Marcel Proust (1871-1922)।

৩৯ John Ruskin (1819-1900)।

৪০ রাস্কিনের যে বইটি গান্ধীকে ভিতর থেকে আলোড়িত করেছিল, তার নাম *Unto this Last* (1862)।

৪১ 'পূরবী'র 'প্রভাত' কবিতায় আছে এই শব্দবন্ধ :

যেন আমি আলোকের নিঃশব্দ নির্ঝরে
মন্থর মুহূর্তগুলি ভাসায়ে দিতেছি লীলাভরে।

কবিতাটি লেখা হয়েছিল ১৯২৪ সালের ১১ নভেম্বর।

৪২ Arthur Rimbaud (1854-91)। শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য (১৯৫৯) -অনূদিত এই লাইনটির মূল আছে *Une Saison En Enfer* (1872) বইতে :

Elle est retrouvée !
Quoi ? I' Eternité.

pathagar.net

খোলা পথের ধারে

১ *The Gardener*-এর (1913) ৮৫-সংখ্যক কবিতার অংশ। এর বাঙলা প্রতিরূপ আছে 'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যের '১৪০০ সাল' কবিতায় :

আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে
হৃদয়স্পন্দনে তব ভ্রমরগুঞ্জনে নব
পল্লবমর্মরে
আজি হতে শতবর্ষ পরে।

২ *Fruit-Gathering*-এর (1916) ৩৪-সংখ্যক কবিতার অংশ। বাঙলা প্রতিরূপ 'কথা ও কাহিনী'র (১৯০০) 'দীন দান' রচনায় :

[সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে
না লয়ে আশ্রয় আজি] পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নামসংকীর্তন।

৩ পেরুর রাজধানী লিমায় রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ এবং আর্জেন্টিনায় তাঁর অবস্থান বিষয়ে নানা লেখকের নানা বিবরণ পাওয়া যায়। বিবরণগুলি পরস্পরবিরোধী না হলেও এর খুঁটিনাটিতে অল্পস্বল্প ভিন্নতা আছে। Charles Freer Andrewsকে (1871-1940) রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখছেন ১৯২৪ সালের ২২ ডিসেম্বর : '.....on October 24, while crossing the Atlantic, I had written a poem addressed to the Terrible.* Since that day, for a long time I suffered so much that I thought I was going to die. When I came to Buenos Ayres the doctor's advice prevented my proceeding to Peru. For nearly two months, therefore, I have been living in strict retirement.' *Peking Tientsin Times*, 14 May 1925.

* কবিতাটির নাম 'ঝড়'। 'পূরবী' (১৯২৫) কাব্যের অন্তর্গত।

William Rothensteinকে (1872-1945) লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৫ সালের ২১ জানুয়ারি: 'You must have heard from Rathi about my invitation to Peru. I fell very ill on the steamer, and for two months in Argentina, under doctor's advice, was soley occupied cultivating, what they call perfect rest. However, this gave me an opportunity to know what genuine feeling the people of that country had for me.' Mary M. Lago, *Imperfect Encounter*, Harvard University Press, 1972. p. 312.

১৯৬৯ সালের ১৩ আগস্ট শ্রীমতী মেরী লাগো কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন সচিব এল্‌ম্‌হার্স্টের সঙ্গে। এই কথোপকথন থেকে তিনি জেনেছেন: 'This invitation was generated in Tokyo in 1924 when diplomatic attaches of five Latin American embassies called on Tagore, pointed out that he has visited every continent except South America and asked whether he would welcome an invitation to visit there. Tagore was to attend Centenary celebrations of the republic of Peru, and he and Elmhirst sailed from Cherbourg on October 18. Tagore fell ill in Argentina, and by the time he was well enough to travel, Peru's celebrations were over.' *Ibid*, p. 312.

Leonard K. Elmhirst (1893-1974) নিজেও লিখেছেন তাঁর Personal Memories of Tagore প্রবন্ধে: 'But in Japan the diplomats from all the countries of South and Latin America had gathered to welcome Tagore and to ask

pathagar.net

him when he would find it possible to see their own part of the world and to visit them. An official invitation came to him in the summer of 1924 from Peru to attend the celebration of the hundredth anniversary of the battle of Ayacucho by which Peru obtained her final freedom from imperial domination... Letters from Romain Rolland and Andrews reached him and warned him to beware of all kinds of possible dangers and political complications in Peru.' *Rabindanath Tagore : A Centenary Volume 1861-1961* Sahitya Akademi, p. 22.

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২) জানিয়েছেন : 'কবি যখন জাপানে (১৯২৪ মে) সেই সময় তিনি দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্য হইতে তথাকার স্বাধীনতা-শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করিবার আমন্ত্রণ পান।' 'য়ুরোপের ফরাসি উপকূল ত্যাগের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে জাহাজ গিয়া দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টাইন দেশের প্রধান বন্দর-নগরী বুইনস এয়ারিস-এ ভিড়িল। অভ্যর্থনার বন্যা পার হইয়া কবি ও এল্‌ম্‌হার্স্ট নগরীর বিশিষ্ট এক হোটেলে গিয়া উঠিলেন। কিন্তু কবির শরীর ক্রমশই খারাপ হইতে লাগিল। স্থানীয় ডাক্তাররা কবির দেহ পরীক্ষা করিয়া পেরুযাত্রা নিষেধ করিলেন; গম্যস্থল বহুদূরে; ট্রেনকে আনডেসের উচ্চতম গিরিপথ দিয়া যাইতে হয়। কবির হৃদ্‌যন্ত্রের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই দীর্ঘপথ অতিক্রমে বিপদের সম্ভাবনা খুবই। বুইনস এয়ারিস-এর নাগরিকরা ২০ মাইল দূরে San Isidore নামক শহরতলীর একটি সুন্দর বাগানবাড়িতে কবিকে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সমস্ত পাবলিক কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া কবি নিরিবিলিতে বাস করিতে লাগিলেন। এ ছাড়া কবিকে বুঝানো হইল যে শতবার্ষিকী

উৎসব আসলে একটি যুদ্ধের দিনের স্মরণ, ইহার মধ্যে কোনো আদর্শবাদ নাই ইত্যাদি। এই সব ঘটনার মধ্যে ইংরেজের রাজনীতিক কোনো চাল ছিল কি না সে বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন।' রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য -প্রবেশক, তৃতীয় খণ্ড ১৩৫৯, পৃ ১৪৫, ১৫৪।

আবার, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১) লিখেছেন: '১৯১৪-এ পেরু কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে বাবা যখন পেরুর স্বাধীনতার শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছেন, তখন সেনিওরা ওকাম্পোর নির্বন্ধাতিশয়ে পেরুভ্রমণ বাতিল করে দিতে হয়। তাঁর ধারণা হয়েছিল অসুস্থ শরীরে আন্দেস পেরিয়ে পেরু-অভিযানের কষ্ট বাবার সহ্য হবে না। ……পেরুর আমন্ত্রণ রক্ষা না করার দরুন আর্জেন্টিনা ও পেরুতে সে-যাত্রা দস্তুরমতো রাজনৈতিক মন-কষাকষি ঘটেছিল।' পিতৃস্মৃতি, ১৩৭৮, পৃ ১৯২-৯৩।

এসব বিবরণ থেকে সম্পূর্ণই ভিন্ন এক কাহিনী পাওয়া যাচ্ছে Hermann Graf Keyserling-এর (1880-1946) স্মৃতিচর্চায়: 'স্বভাবই ছিল ওঁর একে-ওকে বিশ্বাস করে বসা। একবার ভারতবর্ষে পেরু সরকারের প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে এক ঠক ওঁকে আমন্ত্রণ জানাতেই রাজি হয়ে বসলেন। ইংকার স্পেনবিরোধী চেতনার একটি স্মারক অনুষ্ঠানে ওঁকে যোগ দিতে হবে, লোকটির এই আবদার মেনে আচম্‌কা রওনা হয়ে গেলেন বুয়েনস আইরেসে, প্রায় নিষ্কপর্দক অবস্থায়। কবি ভেবেছিলেন ঐ শহর লিমারই নগরপ্রান্তে। পৌঁছে দেখেন কেউ তাঁকে নিতে আসেনি। বিমূঢ়, বাক্যহত, অসহায় কবি সবকিছুতেই তখন বিরক্ত। বন্দরের কোলে একটি ছোট্ট পান্থনিবাসে নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন। সেখানে তাঁকে আবিষ্কার করলেন এই মহিলা [ভিক্টোরিয়া?], তৎক্ষণাৎ সুন্দর নিসর্গপরিবেশে একটি ছোট্ট বাসায় নিয়ে এলেন।' *Reise durch die Zeit*, pt. II, p. 387, শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের (১৯৩৩) অনুবাদ।

Romain Rolland (1866-1944) তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন এই প্রবঞ্চনার বিষয়ে : 'রবীন্দ্রনাথ টোকিওয় দক্ষিণ আমেরিকার কনসালদের কাছ থেকে তাঁদের দেশ দেখার এবং গত ডিসেম্বরে পেরুর জাতীয় উৎসবের দর্শক হবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং ভালো করে জানাশোনার সময় না দিয়েই আর্জেন্টিনা যাত্রা করেছিলেন। বুয়েনোস-এয়ার্সে তিনি অসুখে পড়লেন এবং অসুখ আরও খারাপ হতে পারতো। কারণ এলম্‌হার্স্ট প্রথমে আবিষ্কার করলেন যে, আর্জেন্টিনাস্থ পেরুর রাষ্ট্রদূত রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানোর কিছুই জানেন না ; এবং পেরুর সরকারও তাঁকে কোনো নির্দেশ পাঠায় নি। টেলিগ্রাম চালাচালি হলো এবং অবশেষে, সরকারী আমন্ত্রণ এলো। কিন্তু তা আসতে দেরি হলো এবং এরই মাঝখানে বেশ কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার দেখা দিল। দুটি চিঠিকে কেন্দ্র করে আর্জেন্টিনার সংবাদপত্রগুলো উত্তপ্ত বিতর্কে গা ঢেলে দিল,—একখানা (হায় রে!) আমার ব্যক্তিগত চিঠি, লিখেছিলাম 'ভালোরাথিওনেস্' পত্রিকার তরুণ সম্পাদকদের অনুরোধ জানিয়ে, যাতে সরকারী ভাবে পেরু সফরের বিপদ সম্পর্কে তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে সতর্ক করে দেন : (আসলে আমি জানতাম পেরুর ছদ্ম-প্রজাতন্ত্রী স্বৈরাচারী সরকার—যে-সরকার স্বাধীনচেতাদের নির্বাসিত করে এবং দেশীয় শ্রমিকদের গুলি ক'রে মারে—জনমতকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল ; তাঁকে তার জাতীয় উৎসবাদিতে প্রদর্শন করা হতো এবং এইভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে স্বেচ্ছাচারের সহযোগী ক'রে ফেলতো। কিন্তু দরকার হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে গোপনে সাবধান ক'রে দেবার এবং এটা প্রকাশ্যে বলাটা অযৌক্তিক ছিল, কারণ তাহলে রবীন্দ্রনাথকে এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়া হতো।) আমার চিঠিতে শব্দব্যবহারে তবু একটা মাত্রা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় একটি চিঠি বোমার মতো ফেটে পড়ল। এলম্‌হার্স্ট যা বললেন সেই অনুসারে চিঠিখানায় স্বাক্ষর ছিল আর্জেন্টিনায় আশ্রয়-নেওয়া জনৈক পেরুবাসীর।

কিন্তু এলম্‌হার্স্ট দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাপারস্যাপার এবং লোকজন সম্পর্কে কমই জানেন; আমি প্রায় নিশ্চিত যে চিঠিখানা ছিল আয়া দেলিয়া তোরেসের। এটা ছিল পেরুর নির্বাসন-দাতাদের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড আক্রমণ, এবং নিজের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে সোজাসুজি জড়িয়ে ফেলেছিল…

এদিকে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো না। তিনি পেরু যেতে চাইলেন; সদ্য সরকারী আমন্ত্রণ এসেছে; এবং আর্জেন্টিনা (ঐশ্বর্যে যে ফেটে পড়ছে) তাঁর ইচ্ছেমতো ব্যবহারের জন্য একটা ড্রেডনট (!) দিল গোটা আমেরিকা ঘুরে তাঁকে যাতে সোজা পেরু নিয়ে যেতে পারে। ঠিক তখনই, পরামর্শক চিকিৎসকেরা আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সফর নিষেধ ক'রে দিলেন।—ভীষণ অস্বস্তিকর অবস্থা! পেরুযাত্রা প্রত্যাখ্যান সংবাদপত্রের প্রচারের সময়ের সঙ্গে মিলে গেল। এটাকে ব্যাখ্যা করা হতে পারে—ব্যাখ্যা করা হবেই—পেরুর সরকারের প্রতি প্রযুক্ত সম্মানহানিকর এক অস্বীকৃতি হিসেবে। রবীন্দ্রনাথই শুধু এই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়লেন না, আর্জেন্টিনা সরকারের অস্বস্তি হলো অনেক বেশি। তার ভয় হলো, পেরু না অভিযোগ করে যে সে-ই রবীন্দ্রনাথকে যাত্রার মত পরিবর্তন করিয়েছে; তখন এই সংকটজনক মুহূর্তে তার প্রাণপণ চেষ্টা হলো, পেরুর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখা। তাই, সে রবীন্দ্রনাথ এবং এলম্‌হার্স্টের যুক্তি বুঝতে চাইল না; সে জোর করতে লাগলো যে তাঁকে স্বীকৃত কর্মসূচি মানতে হবে।—শেষ পর্যন্ত পেরু-সফর ও থাকা খাওয়ার অতি আবশ্যক খরচার জন্যে একটা টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এলম্‌হার্স্ট রাষ্ট্রদূতের কাছে তা জানাতে এলেন। কিন্তু টাকা ফিরিয়ে দেওয়াটা বাধাপ্রাপ্ত-যাত্রার সন্দেহজনক চরিত্রকে আরও প্রকট ক'রে তুললো। এ সম্পর্কে আলোচনার পর, মনে হয় পেরুর রাষ্ট্রদূত ঔদার্য দেখিয়ে বললেন, যা হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই এবং সেই টাকা রেখে দিতে এলম্‌হার্স্টকে বাধ্য করলেন।—অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত জটিলতা বিষয়ে শুধু একটু আধটু জানতেন,

pathagar.net

তার বৃত্তান্ত তাঁর কাছে চেপে যাওয়া হয়েছিল কারণ তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে নজরটাই কাম্য ছিল। কিন্তু অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হওয়ায় তিনি বুঝেছিলেন কিছু ব্যাপার তাঁর কাছে গোপন করা হচ্ছে এবং তাঁর কল্পনা ধৈর্য হারাচ্ছিল। কেবলমাত্র জাহাজে বুয়েনোস-এয়ার্স আর জেনোয়ার মাঝখানে এলমহার্স্ট তাঁকে সব খুলে বলেছিলেন।' শ্রীঅবন্তীকুমার সান্যালের অনুবাদ, 'ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী ১৯১৫-১৯৪৩', ১৯৭৬, পৃ ৮৪-৮৫।

পেরুর উৎসব অনুষ্ঠানের কথা ছিল ৯ ডিসেম্বর ১৯২৪। কলম্বো থেকে রবীন্দ্রনাথ ইওরোপগামী হারুনা-মারু জাহাজে ওঠেন ২৪ সেপ্টেম্বর। শেরবুর্গ বন্দর থেকে আন্দেস জাহাজে ওঠেন ১৮ অক্টোবর। অ্যাণ্ডরুজের কাছে লেখা চিঠি থেকে বোঝা যায় যে অসুস্থ বোধ করেন তিনি ২৪ অক্টোবরের পর থেকে। আর, জাহাজ বুয়েনস আইরেসে পৌছয় ৬ নভেম্বর।

৪ Andre Gide (1869-1951) 'গীতাঞ্জলি'র (১৯১০) ফরাসি অনুবাদ করেন ১৯১৪ সালে : *L' offrande Lyrique*।
শতবার্ষিক সংগ্রহের লেখাটিতে ভিক্টোরিয়া এখানে আরো একটি অনুবাদের উল্লেখ করেছেন। সেটি হলো Zenobia Camprubi Jimenez-এর স্পেনীয় অনুবাদ *Ofrenda Lyrica* (1918)।

৫ এটা যে তাঁর জীবনের কত বড়ো ঘটনা, চিঠিপত্রেও ভিক্টোরিয়া সে-কথা মাঝে মাঝেই জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে। দুটি অংশ এখানে তুলনীয়।
'The weeks you stayed in San Isidro were some of the lovelier weeks I have known and I always think of them and of you with all my love.' 1929 July 13
'The mist of homesickness is in me too and has been in me since you left San Isidro, 15 years ago (how very long it seems, how *unreally* long ago) Those days in 'Miralrio' are some of the happiest I have ever known

and I can't go near that house or in that garden without being *stabed* (sic) by that remembrance, and by the 'never more' it brings within its sweetness. To have you living there, to see you every morning and every afternoon, and every night ; to hear you……what an unforgotten delight ! I loved you and love you very dearly. I hope you do know it.' 1939 February 23

রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত চিঠিপত্র থেকে গৃহীত।

৬ Dante Alighieri (1265-1321)।

John Ruskin (1819-1900)।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)।

৭ Victor Marie Hugo (1802-85)।

৮ Pierre Teilherd de Chardin (1881-1955)।

৯ Victoria Ocampo, *Testimonios*, 1935-47, ৬ খণ্ডে প্রকাশিত প্রবন্ধসংকলন।

১০ Henri Louis Bergson (1859-1941)।

বার্মিংহামে বের্গসঁর এই বক্তৃতাটির তারিখ ১৯১১ সালের ২৪ মে। 'চেতনা আর জীবন' নয়, লেখাটি ছাপা হয়েছিল 'জীবন আর চেতনা' নামে। দ্রষ্টব্য Life and Consciousness, *Mind-Energy : Lectures & Essays*, tr. H. Wildon Carr, London, 1921, p. 23।

বের্গসঁ-র এই মন্তব্যের সঙ্গে তুলনা করে পড়বার যোগ্য রবীন্দ্রনাথের এই অনুচ্ছেদটি : 'সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরে কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়; এইজন্য সুখের পক্ষে ধুলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধুলা ভূষণ। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত; আনন্দ যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া

পরিতৃপ্ত ; এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য।' পাগল, বিচিত্র প্রবন্ধ, ১৯৫৮, পৃ ৯৯।

১১ Marcel Proust ((1871-1922) রচিত দীর্ঘ উপন্যাস *A la Recherche du temps perdu* (1913-28)-এর প্রথম খণ্ড *Du Côté de chez Swann* (1913)।

১২ Henry Beyle-এর ছদ্মনাম, Stendhal (1783-1842)।

১৩ Jose Ortega y Gasset (1883-1955) প্রুস্ত বা তাঁর সৃষ্ট চরিত্র সোয়ান প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন একাধিক আলোচনায়। *The Dehumanization of Art* বইটির 'Notes on the Novel' আর *Man and People*-এর 'The other Man Appears' লেখাদুটি দ্রষ্টব্য।

১৪ Charles Baudelaire (1821-67)-এর *Moesta et errabunda* কবিতার অংশ। মূল তিনটি লাইন :

Mais le vert paradis des amours enfantines,
L'innocent paradis, plein de plaisirs furtifs,
Est-il de´ja` plus lion que l'Inde et que la Chine ?

১৫ প্রুস্তের পূর্বকথিত দীর্ঘ উপন্যাস *A la Recherche du temps perdu* (1913-28)।

১৬ ভিক্টোরিয়া এখানে উল্লেখ করেছেন ফরাসি দার্শনিক পাস্কালের একটি শব্দবন্ধ 'Sensible au Coeur': হৃদয়ের পক্ষে স্বাস্থ্যজনক। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যাঁরা পড়েছেন তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না যে অনুবাদের শব্দবন্ধ আমি ব্যবহার করেছি 'প্রহাসিনী' (১৯৩৯) কাব্যের 'আধুনিকা' কবিতা থেকে :

যে ভোলা সহজ ভোলা নিজের অলক্ষ্যে
সেই ভালো হৃদয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে।

১৭ Leo Nikolayevich Tolstoy (1828-1910) প্রসঙ্গে ভিক্টোরিয়ার এই মন্তব্যের অভিপ্রায় খুব স্পষ্ট নয়। *Anna Karenina* (1875-

pathagar.net

77)-তে এ-রকম বর্ণনা আছে বটে (প্রথম খণ্ড, উনত্রিংশ অধ্যায়) : ট্রেনযাত্রিণী আনা মন দেবার চেষ্টা করছে এক ইংরেজি উপন্যাসে, আর সেখানে সে মনে মনে বারেবারেই হয়ে উঠছে বইয়ের চরিত্র, কখনো নায়িকা কখনো নায়ক। কোনো সমালোচক বলতে পারেন যে অবক্ষীয়মাণ সমাজে বইপড়ার ভুল ধরনটা এখানে দেখিয়ে দিলেন টলস্টয়।

কিন্তু ভিক্টোরিয়া যে বলছেন রবীন্দ্রনাথ পড়তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠা অথবা কোনো গান শুনবার সময়ে হয়ে ওঠা গান, এই প্রবণতাকে কি শেষ পর্যন্ত ভয় করেছিলেন টলস্টয়? তাঁর পরিণত শিল্পতত্ত্বে বরং একটা একাত্মীকরণের কথাই বলা আছে বারবার। 'শিল্প কী' (১৮৯৮) বই থেকে দু' একটি টুকরো এখানে দেখা যাক :

'The feeling of *infection* by the art of music, which seems so simple and so easily obtained…' p. 200.

'…*mingle souls* with another – which is the very essence of art.' p. 216.

'The chief peculiarity of this feeling is that recepient of a truly artistic impression is so *united* to the artist that he feels as if the work were his own and not someone else's – as if what it expresses were just what he had been wishing to express. A real work of art *destroys in the consciousness of the recepient the separation between himself and the artist*……' p. 118.

What is Art and Essays on Art, tr. Aylmer Maude, London, 1962. বাঁকা হরফ আমার।

১৮ Joaquin V. Gonzalez, *Cien Poemas de Kabir* (1914) । *One Hundred Poems of Kabir* (1914) গ্রন্থের স্পেনীয় অনুবাদ।

১৯ *Sadhana* (1913) বইটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'For

Banglaforum.net

western scholars the great religious scriptures of India seem to possess merely a retrospective and archaeological interest ; but to us they are of living importance.'

২০ *Sadhana*-র বক্তৃতামালা অথবা রবীন্দ্রনাথের উক্ত মন্তব্য, এ সবই ১৯১৩ সালের ঘটনা। ভিক্টোরিয়া এখানে ১৯২১ কী অর্থে লিখেছেন তা বোঝা যায় না। ছাপার ভুল? কিন্তু *Indian Literature*-এর (April-Sept, 1959) লেখাটিতেও ওই একই তারিখ। এমনও নয় যে ওই বছরে এর কোনো স্পেনীয় বা ফরাসি অনুবাদ হয়েছিল।

২১ রবীন্দ্রনাথের বহু-ব্যবহৃত এই শব্দবন্ধ 'ঈশোপনিষদ্'-এর প্রথম শ্লোক থেকে গৃহীত :

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥

২২ St. Thomas Aquinas (1225-74)। তু. 'God is said to be united to a creature inasmuch as the creature is really united to God without any change in Him. A man is called creator and is God because of the union…' *The Summa Theologia*, Vol. II, tr. Fathers of the English Dominican Province, New York, 1947, p. 2040.

২৩ এই 'মিলনক্ষুধা' প্রসঙ্গে ভিক্টোরিয়ার একটি পত্রাংশও স্মরণীয়। ১৯২৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর তিনি লিখছেন রবীন্দ্রনাথকে : Many people had asked me : What is Rabindranath Tagore's religion ? At the end of my lecture I said 'I see only one way of explaining to you in a few words Tagore's religion. It is by quoting St. Thomas' definition of love : the hunger of unity. Through joy and through sorrow you will hear in his poems the cry of that *hunger of unity*.'

রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত চিঠিপত্র থেকে গৃহীত।

২৪ 'গীতাঞ্জলি'র ফরাসি অনুবাদের ভূমিকায় আঁদ্রে জিদ লিখেছিলেন: 'গীতাঞ্জলিতে প্রথম আমাকে যা মুগ্ধ করে তা হলো এর ছোটো আয়তন। গীতাঞ্জলিতে আমাকে মুগ্ধ করে এই যে, কোনো উপকথা দিয়ে এ ভারাক্রান্ত নয়। গীতাঞ্জলিতে যা আমাকে মুগ্ধ করে তা হলো এই যে, এ-কাব্য পাঠের জন্য প্রয়োজন নেই কোনো প্রাথমিক প্রস্তুতির।'

২৫ *Chitra* (1913)। 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২) গ্রন্থের অনুবাদ। ইংরেজি অনুবাদে চিত্রাঙ্গদার নাম যে চিত্রা হয়ে দাঁড়াল, সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কৈফিয়ৎ এই রকম: 'The name of the heroine in Mahabharata is Chitranganda but as you have no soft dental d in your alphabet and as your readers are sure to put accent in the wrong place making it sound very unmusical, I have ventured to cut it short, retaining the first portion used by her parents if she ever did have any name and parents to boot.' ১৯১৩ সালের ৭ নভেম্বর শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ একথা লিখে পাঠান উইলিয়ম রোটেনস্টাইনকে। Mary M. Lago, *Imperfect Encounter*, Harvard University Press, 1972, p. 129.

২৬ ভিক্টোরিয়া এখানে ব্যবহার করেছেন *Chitra* থেকে এই অংশটুকু: If you deign to keep me by your side in the path of danger and daring, if you allow me to share the great duties of your life, then you will know my true self.

২৭ Blaise Pascal (1623-62)-এর *Les Pensées* (1670) বই থেকে ৪৫৮-সংখ্যক সূক্তি এখানে স্মরণীয়: 'Happy they who···are not overwhelmed or carried away, but···stretch out hands to him···and yet they weep···at the remembrance of their loved country···'

pathagar.net

এই উদ্ধৃতি নেওয়া হলো Thomas Stearns Eliot (1888-1965)-এর ভূমিকা সংবলিত *Pascal's Pensées* থেকে।

২৮ শেষ এই বাক্যাংশটি ভিক্টোরিয়া নিজের ভাষায় লেখেন নি, ব্যবহার করেছেন দান্তের এই কথা : letizia che trascende ogni dolzore। Paradisoর ত্রিংশ সর্গের ৪২-সংখ্যক লাইনে এটি আছে।

২৯ বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণের তৃতীয় উক্তি (২।৪।৩) থেকে বাক্যটি গৃহীত। সম্পূর্ণ উক্তিটি এইরকম : 'সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি॥' ('সেই মৈত্রেয়ী বললেন, যা দিয়ে আমি অমৃত হব না তা দিয়ে আমি কী করব? আপনি যা জানেন, কেবল তাই আমাকে বলুন।')

৩০ *The Gardener*-এর ২৮-সংখ্যক কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছেন ভিক্টোরিয়া। অনুবাদে দেওয়া হলো মূল কবিতাটি : 'সোনার তরী' কাব্যের 'দুর্বোধ'।

৩১ দান্তের *La Divina Commedia* (1316-21) কাব্যের একটি টুকরো। Paradiso অংশের ৩১-সংখ্যক সর্গের তিনটি লাইন (৮৫-৮৭); মূল লাইনকটিই ব্যবহার করেছেন ভিক্টোরিয়া :

Tu m'hai di servo tratto a libertate
Per tutte quelle vie, per tutti'i modi
Che di cio fare avei la potestate.

৩২ *Sadhana*-র The Relation of the Individual to the Universe প্রবন্ধটি থেকে গৃহীত অংশ। রবীন্দ্রনাথের বাক্যটির সূত্রপাতে আছে 'In literature', ভিক্টোরিয়া তার সঙ্গে যোগ করেছেন 'Modern European' শব্দদুটি। দ্র *Sadhana*, London, 1947, p. 11.

৩৩ *One Hundred Poems of Kabir* (1914) বইটির ৫০-সংখ্যক কবিতায় আছে 'When love renounces all limits, it reaches

pathagar.net

truth'। এই উক্তিটিই ভিক্টোরিয়ার লক্ষ্য। কবীরের মূল কবিতাটির শুরু 'মুরলী বজত অখণ্ড সদাই।' দ্র. ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০) সংকলিত 'কবীর'-এর প্রথম খণ্ড, ১৯১০, পৃ ১২৬-২৭। লাইনটি হলো : প্রেম হদ্দ তজী জব ভাঈ, সত্তলোক কী হদ্দ পুনি আঈ।

৩৪ 'সোয়ানের পথ' (*Du côté de chez Swann,* 1913) উপন্যাসে প্রুস্ত বারংবার এক নিগূঢ় সাংগীতিক অভিজ্ঞতার কথা বলেন। উদাহরণ হিসেবে একটি মন্তব্য এখানে সংকলন করা যায়, ইংরেজি অনুবাদ থেকে :

'And the pleasure which the music gave him, which was shortly to create in him a real longing, was in fact closely akin, at such moments to the pleasure which he would have derived from experimenting with perfumes, from entering into contact with a world for which we men were not created, which appears to lack form because it escapes our intelligence, to which we may attain by way of one sense only.' *Swann's Way,* tr. C. K. Scott Moncrieff, New York, 1956, p. 341.

তবে প্রুস্ত অসীমতার সন্ধান পান একমাত্র যখন তিনি সংগীতের কথা বলেন, ভিক্টোরিয়ার অনুসরণে একথা ভাবলে একটু হয়তো ভুলই হবে। প্রকৃতিও তাঁকে নিয়ে যায় অসীমের স্পর্শে। যেমন :

'...and towards evening, when it was filled like a distant haven with the roseate dreams of the setting sun, increasingly changing and ever remaining in harmony, about the more parmanent colour of the flowers themselves, with the utmost profundity, evanescence, and mystery – with a quiet suggestion of *infinity ;* afternoon or evening, it seemed to have set them flowering in the heart of the sky.' *Ibid,* p. 244.

pathagar.net

৩৫ এই কথাগুলি আছে 'সোয়ানের পথ' উপন্যাসের প্রায় শেষ দিকে। ওকাম্পোর অনুবাদের সঙ্গে অবশ্য এর কিছুটা অমিল আছে। '...in that great black impenetrable night, discouraging exploration, of our soul, which we have been content to regard as valueless and waste and void.' *Ibid*, p. 503.

৩৬ এটিও 'সোয়ানের পথ'-এর অন্তর্গত: 'And death in their company is something less bitter, less inglorious, perhaps even less certain.' *Ibid.* p. 504.

অলিন্দ

১ *Gitanjali* (1912) কাব্যের ভূমিকায় William Butler Yeats (1865-1939) এই মন্তব্য করেন।

২ *Gitanjali*-র ৪৩-সংখ্যক কবিতা থেকে। কবিতাটির মূল আছে 'নৈবেদ্য' (১৯০১) কাব্যের ৩৩-সংখ্যক রচনায়:

কত মুহূর্তের 'পরে
অসীমের চিহ্ন রেখে গেছ!

৩ 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) কাব্যের ১৫১-সংখ্যক গান। ভিক্টোরিয়া ব্যবহার করেছেন এর অনুবাদ, *Gitanjali*-র ১৭-সংখ্যক কবিতা।

৪ Charles Peguy (1874-1914)।

৫ 'গীতাঞ্জলি' ১৫২, *Gitanjali* ৩২।

৬ 'খেয়া' (১৯০৬) কাব্য থেকে 'দান' কবিতার একটি অংশ, *Gitanjali* ৫২।

৭ 'গীতাঞ্জলি' ২৪, *Gitanjali* ৭৯।

৮ 'গীতাঞ্জলি' ২৫, *Gitanjali* ৮৪।

৯ 'খোলা পথের ধারে' পরিচ্ছেদের ২৩-সংখ্যক সূত্র দ্রষ্টব্য।

১০ 'পূরবী' (১৯২৫) কাব্যের রচনাগুলির তারিখ লক্ষ করলে বোঝা যাবে

pathagar.net

যে, অন্তত নভেম্বরের ৭ তারিখ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আন্দেস জাহাজে ছিলেন। ৬ নভেম্বর লিখছেন 'ভাবীকাল', ৭ তারিখেও জাহাজে বসেই লিখেছেন 'অতীতকাল' আর 'বেদনার লীলা'।

১১ Romain Rolland, *Mahatma Gandhi*, Paris, 1924।

১২ রবীন্দ্রনাথের 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধের ইংরেজি পাঠ ছাপা হয় *Modern Review* পত্রিকায়, ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে গান্ধী এর উত্তর দেন *Young India* পত্রিকার ১৩ অক্টোবর সংখ্যায়। এই উত্তরকথনের শিরোনাম ছিল 'The Great Sentinel'। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে এই অভিধাটি তার পর থেকে প্রায়ই আমরা শুনতে পাই।

১৩ ১৯২০ সালের ২৮ জুলাই গান্ধী ঘোষণা করেন যে ভারতে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হচ্ছে ১ অগস্ট। এই তারিখে তিনি প্রত্যাহার করলেন সরকারের দেওয়া সমস্ত পদবী আর পুরস্কার। ৮ সেপ্টেম্বর কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে এবং ৩০ ডিসেম্বর নাগপুরের সাধারণ অধিবেশনে সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেস।

১৪ একথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বন্ধু অ্যাণ্ডরুজকে। দেশে অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনা চলছে, ভাগ্যের পরিহাসে বিদেশে তখন প্রচার করছেন তিনি সহযোগের তত্ত্ব: এসব কথা জানিয়ে কবি লিখছেন, 'We are beginning to discover that our problem is world-wide, and no people of the earth can work out its salvation by detaching itself from others. Either we shall be saved together or drawn together into destruction.' 1921 March 13. *Letters to a Friend*, London, p. 133.

১৫ রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী বিতর্কের কোনো কোনো কথা ভিক্টোরিয়া সংগ্রহ করেছেন সম্ভবত রোমঁ্যা রলাঁর গান্ধী-বিষয়ক বইটি থেকেই। 'মহান্ সান্ত্রী' (The Great Sentinel, *Young India*, 1921.

pathagar.net

October 13) প্রবন্ধটির বিবরণ দিতে গিয়ে রলাঁ উল্লেখ করেছেন গান্ধীর উক্তি : 'সকলকেই চরকা কাটতে হবে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও কাটুন না। আজকের কর্তব্য তাই—কাল কী হবে, তা ভগবান দেখবেন।' শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্যের অনুবাদ, 'গান্ধী—রম্যাঁ রলাঁর দৃষ্টিতে,' ১৯৬৯, পৃ ৬৯।

এই তর্কসূত্রে কিছুদিন পর আবার লেখেন গান্ধী : 'If the poet span half an hour daily his poetry would gain in richness.' (*Young India,* 1921 November 5)।

অসহযোগ বিষয়ে এই বিতর্কের জন্য দ্রষ্টব্য *Truth Called Them Differently*, ed. R. K. Prabhu and Ravindra Kelekar, Ahmedabad, 1961.

১৬ গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নির্বাচনের এই প্রশ্ন, এই তুলনা সেদিনকার অনেক পশ্চিমবাসীর মনেই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। দু-একটি উদাহরণ এখানে মনে করা যায়। ফরাসি দেশের এক মহিলা (মাদাম জান রানে) লিখছেন : 'রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবতে গেলে তাঁর বিরাট সমসাময়িক মহাত্মা গান্ধীর কথাও না ভেবে পারি না। এঁরা দুটি সত্তা, প্রতিপক্ষী দুই নিয়তি, কবি হলেন চেহারায় শিক্ষায় চরিত্রে পারিপার্শ্বিকে ষোল আনা আভিজাত্যের মালিক, আর মহাত্মাজী হলেন আইনজ্ঞ বিরাগী লোকনেতা কর্মবীর।' শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৯৩৬) অনুবাদ, 'ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ', ১৯৬৩, পৃ ৯২।

Andre´ Maurois (1885-1967) লিখেছেন : 'গান্ধী হলেন আবহমানতা, রবীন্দ্রনাথ কবিতা, নেহেরু ভবিতব্য।' তদেব, পৃ ১১০। রোম্যাঁ রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন একটি চিঠিতে : 'In a chapter of my Essay I have taken the liberty, according to your admirable essays already published, of recalling the position you have taken up with regard to Gandhi, and the noble debate of ideas which has been evoked

Pathagar.net

between you. The highest human ideals are confronted therein. It seems as if it were a controversy between a St. Paul and a Plato.' বিশ্বভারতী প্রকাশিত *Rolland and Tagore* (1945) বই থেকে, পৃ ৩৬-৩৭।

১৭ Romain Rolland, *Inde : Journal 1915-1943 Tagore, Gandhi, Nehru et les Problemes Indiens*, Paris, 1951, pp. 50-52. আরো দ্রষ্টব্য শ্রীঅবন্তীকুমার সান্যালের অনুবাদ, 'ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী ১৯১৫-১৯৪৩', ১৯৭৬, পৃ ৫২-৫৩। চিঠিটিতে যাঁর নামের আদ্যক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে, তিনি William Winstanley Pearson (1881-1923)।

১৮ *Gitanjali*তে ইয়েট্‌সের লেখা ভূমিকা থেকে : 'And then he said with deep emotion : He is the first among our saints who has not refused to live, but has spoken out of life itself, and that is why we give him our love.'

১৯ 'বিজয়া' অংশের ১৭-সংখ্যক সূত্র দ্রষ্টব্য। তার সঙ্গে এখানে যুক্ত করে নেওয়া যায় আরো এই মন্তব্যগুলি :

'আমি গুরু না, রাষ্ট্রনেতা না,—আমি কবি, সৃষ্টির বিচিত্র খেলায় নানাছন্দে গড়া খেলনা জোগাব, এই আমার স্বধর্ম, এই আমার কাজ। তাতে মানুষের যেটুকু আনন্দ সেইটুকুতেই আমার সার্থকতা। এই আমার স্বধর্ম, আর সেই স্বধর্মরক্ষার দায়িত্বই আমার। আমার কাছ থেকে রাষ্ট্রনৈতিক সুবুদ্ধি, কর্মনৈতিক নৈপুণ্য যারা আশা করেছে তারা নিজে ভুল করেছে, অথচ আশাভঙ্গের দুঃখের জন্যে আমাকেই দায়ী করেছে।' ১৭ এপ্রিল ১৯২৬। চিঠিপত্র ৭, ১৯৬০, পৃ ১১৮।

'আমি গুরু নই আমি কবি।' ২৩ এপ্রিল ১৯৩১। চিঠিপত্র ৯, ১৯৬৪, পৃ ১২।

'চিরদিন আমি গুরুমশায়কে এড়িয়ে এসেছি, ইস্কুলপালানো আমার অভ্যাস—অবশেষে আমি নিজেই গুরুমশায় সেজে বসব এর চেয়ে প্রহসন

pathagar.net

কিছু হতে পারে না।' ১৭ বৈশাখ ১৩৩৮। তদেব, পৃ ১৯।

'গুরুর পদ আমার নয় সে আমি নিশ্চিত জানি। আমি অনুভব করি, আমি কথা কই এইটেই আমার স্বধর্ম। তোমার চিঠিতে আমি কথা কয়ে গেছি সেটা শুনিয়েচে অনুশাসনের মতো। কিন্তু প্রকাশ করা যদিও আমার স্বভাবসংগত, প্রচার করা একেবারেই নয়।' ৩১ জুলাই ১৯৩১। তদেব, পৃ ৭৭।

'আমি কি আজ পর্যন্ত কাউকে ভিতর থেকে আলো দিতে পেরেছি? আমি কী রকম জানো, যেন সূর্যরশ্মিতে উদ্দীপ্ত অগ্নিবর্ণ সন্ধ্যাবেলাকার মেঘের মতো। সে আলো চোখে দেখতে পাবে, ভালো লাগবেও হয়তো,—কিন্তু রাত্রের অন্ধকার পথে চলবার জন্যে তার থেকে কেউ কি আলো সঞ্চয় করতে পারবে, কেউ কি জ্বালাতে পারবে আপন ঘরের প্রদীপ?' ১৪ নভেম্বর ১৯৩২। তদেব, পৃ ১৮৩।

২০ রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত চিঠি।

২১ Leonard K. Elmhirst (1893-1974) রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে ছিলেন ১৯২১ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত। প্রধানত তিনি ছিলেন শ্রীনিকেতনের সংগঠনে। ১৯২৪ সালে চীন-জাপান আর দক্ষিণ আমেরিকার অভিজ্ঞতায় কবির ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন এল্‌ম্‌হার্স্ট।

'নির্বাণ' (১৯৪২) বইতে প্রতিমা দেবী লিখেছেন, পৃ ৬০:

'বাবামশায় দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফিরে এসে আমার স্বামীকে বলেছিলেন, দেখ রথী, আমি অনেক সেক্রেটারি পেয়েছি কিন্তু এল্‌ম্‌হার্স্টের মতো সব দিকে উপযুক্ত লোক খুব কম দেখেছি; ও আমার এত সেবা করেছে, আমাকে কিছু বলতে হতো না। ছোটো কাজ থেকে বড়ো কাজগুলি সবই নিজের হাতে করত এবং সব সময় আমার মন বুঝে এমন চলত যে, আমাকে কখনো অসুবিধেয় পড়তে হয়নি, উপরন্তু খুব আরাম পেয়েছি, ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে।'

২২ এই সানাটোরিয়ামের প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল হয়। ভিক্টোরিয়াকে রবীন্দ্রনাথ যখন এই চিঠি লিখছেন (২ অগস্ট), তার অল্পদিন পর,

pathagar.net

১৮ অগস্ট রলাঁ লিখছেন রবীন্দ্রনাথকে : 'Your telegram of the 17th is heart rending!···Everything was ready for receiving you. Rooms, doctors, and friends desirous of laying with you the foundations of an Asiatico-European Intellectual union. There is a cruel fate working against us.' *Rolland and Tagore*, p. 54.

২৩ ১৯২৫ সালের ২ অগস্ট লেখা চিঠি থেকে। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত। লক্ষণীয় যে এই চিঠিটির যতখানি উদ্ধৃত করেছেন ভিক্টোরিয়া, তার ঠিক পরেই ছিল এই কথা : Very few people will know that they ought also to thank you for this gift of lyrics which I am about to offer to them.

২৪ এখানে ভিক্টোরিয়া তাঁর বন্ধুর নাম করেন নি। কিন্তু নাম জানা যায় এল্‌ম্‌হার্স্টের স্মৃতিচারণ থেকে : Adelia Acevedo। এল্‌ম্‌হার্স্ট লিখছেন : 'Newspapermen and various interested persons crowded to see Tagore in a big hotel in Buenos Aires where neither of us knew a soul. Among the crowd were two ladies, Senorita Adelia Acevedo and Madame Victoria Ocampo. They promised to obtain the services of competent doctors and, on the recommendation of a heart specialist that absolute rest was essential, we grabbed at their suggestion of an escape, to a scheduled villa on the banks of the river La Plata.' *Rabindranath Tagore, A Centenary Volume 1861-1961*, pp. 22-23।

'নিঃসঙ্গ পুরুষ' অধ্যায়ে ভিক্টোরিয়াও এই নাম একবার উল্লেখ করেছেন।

২৫ President Leguia।

২৬ মৃণালিনী সরাভাই (১৯২৮)। ভারতনাট্যমের প্রসিদ্ধ শিল্পী, পরে

pathagar.net

কথাকলিরও চর্চা করেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে ছিলেন কিছুদিন, তাঁর অনেক নৃত্যনাট্যের প্রধান ভূমিকায় ছিলেন তিনি। 'দর্পণা'র নৃত্যদল নিয়ে মৃণালিনী দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছিলেন ১৯৫০ সালে, সেখানে মঞ্চস্থ হয়েছিল 'চিত্রাঙ্গদা'।

২৭ রোম্যাঁ রলাঁর রবীন্দ্রবিষয়ক লেখাগুলি ভিক্টোরিয়া ভালো করে পড়েছিলেন বলেই তাঁর এই মুগ্ধ রূপবর্ণনার সঙ্গে তুলনা করে দেখতে ইচ্ছে হয় রলাঁর বর্ণনা। রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখে (১৯ এপ্রিল ১৯২১) রলাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল এইরকম : 'He is in Hindu costume, with a high cap of black velvet, and a long, beige-colored robe. He is very handsome—almost too handsome—tall, a fine regular figure, pure Aryan, but of that warm skin-color which brings golden sunlight to life, luminous brown eyes, in the shadow of beautiful eyelashes, a straight nose, a mouth smiling under a white moustache, a silky beard with three points, the middle one still black between the two other white ones. His whole countenance beams with an abundant and tranquil joy, which translates itself in all that he says.' *Inde : Journal 1915-1943*, p. 17। এখানে এই অনুবাদটি নেওয়া হলো Stephen N. Hayর *Asian Ideas of East and West* বই (Harvard University Press, 1970) থেকে, পৃ ৩৬৩-৬৪। আরো দ্রষ্টব্য শ্রীঅবন্তীকুমার সান্যালের অনুবাদ, 'ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী ১৯১৫-১৯৪৩', ১৯৭৬, পৃ ১১।

২৮ 'মিরালরিও' শব্দটির অর্থ "স্রোতস্বিনীকে দেখা"। একটি সুউচ্চ মালভূমির উপর এই গৃহটি অবস্থিত। এর সম্মুখ ও পশ্চাতে বিশাল প্রাঙ্গণ। সবুজ ঘাসের গালিচা দিয়ে মোড়া এই প্রাঙ্গণটির সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। মাঝে মাঝে ফুলের মালঞ্চ এবং বহু বিচিত্র পুষ্পের বর্ণচ্ছটায়

সমস্ত প্রাঙ্গণটিকে যেন মোহময় করে রেখেছে॥ প্রাঙ্গণের সীমানারেখার চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে বয়ঃবৃদ্ধ ওক গাছ আর দীর্ঘ পাইন বন। সমস্ত বাড়িটিকে ঘিরে বিরাজ করছে একটি অখণ্ড শান্তি। গৃহ থেকে উত্তর দিকে কয়েক পা অগ্রসর হলেই দেখতে পাওয়া যায় ওপরের তটরেখাহীন বিশাল নদী প্লাতা। প্লাতা শব্দটির অর্থ রূপা।' শ্রীজ্যোতির্ময় মৌলিক, 'বিজয়ার করকমলে', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ বৈশাখ ১৩৭৭। শ্রীমৌলিক এই বাড়িটি দেখেছেন।

কথাসূত্রে শ্রীমৌলিককে ভিক্টোরিয়া বলেছিলেন: 'আমার খুড়তুতো ভাইয়ের বাড়ি মিরালরিও কবির বাসের জন্য ঠিক করে ফেললাম ভাইকে অনেক টাকা ভাড়ার লোভ দেখিয়ে।' পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

২৯ ১২ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ এসে পৌঁছলেন সান ইসিদ্রোর পুষ্পশোভিত বাড়িটিতে, আর সেইদিনই লেখা হলো 'পূরবী'র অন্যতম খ্যাত কবিতা 'বিদেশী ফুল।'

হে বিদেশী ফুল, আমি কানে কানে শুধানু আবার,
'ভাষা কী তোমার?'
হাসিয়া দুলালে শুধু মাথা,
চারিদিকে মর্মরিল পাতা।

... ...

দুই দিন পরে
চলে যাব দেশান্তরে
তখন দূরের টানে স্বপ্নে আমি হব তব চেনা,—
মোরে ভুলিবে না।

৩০ বোদলেয়রের *Le Balcon* কবিতার এক লাইন:

Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses!

৩১ ১৯২৫ সালের ৩১ মার্চে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটির একটি বাক্যকে এখানে খণ্ডিতভাবে ব্যবহার করেছেন ভিক্টোরিয়া। সম্পূর্ণ বাক্যটি এইরকম: 'In this state of physical feebleness my mind

pathagar.net

often wanders back to that balcony in San Isidro *seeking for your ministration of love*।' বাঁকা হরফের অংশটুকু ভিক্টোরিয়ার রচনায় বর্জিত।

৩২ শতবার্ষিক সংগ্রহের প্রবন্ধটিতে ('Tagore on the Banks of the River Plate') এদের নাম দেওয়া আছে: Jose আর Filomena।

৩৩ উদ্ধৃত এই অংশ গৃহীত হলো শ্রীমতী রানী চন্দের 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' বই থেকেই। কিন্তু এর সম্পূর্ণ টাই ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে বলা নয়। ভিক্টোরিরা এখানে দুটি ভিন্ন অংশকে জুড়ে দিয়েছেন। 'সেদিন বিজয়ার চিঠি পেলুম' থেকে 'কেন স্প্যানিশ ভাষা শিখিনি কোনোদিন' পর্যন্ত কথাগুলি বলা হয়েছিল ১৯৩৪ সালের ২৯ জুলাই। কিন্তু পরবর্তী আলাপচারির তারিখ ২৩ মে ১৯৪১। দ্রষ্টব্য, আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬২, পৃ ৯-১১/১০৮-১০। ভিক্টোরিয়া অবশ্য লেখিকার নাম বলেছেন 'রানী চন্দ্র'।

৩৪ এই প্রসঙ্গে ভিক্টোরিয়ার কয়েকটি পত্রাংশ স্মরণীয়।

'But I won't bother you with sentimental descriptions of my feelings (partly, because it is too difficult to find expression for them in English, partly, because I am rather depressed).' ১৫ জানুয়ারি ১৯২৫।

'How can I thank you in English, when I find it would be difficult to thank you in French or in Spanish! There are no words.....I can't translate my heart in English!' ২৮ ডিসেম্বর, ১৯২৫।

৩৫ তাঁর দেশীয় পাঠকদের জন্য ভিক্টোরিয়া এখানে নিবেদিতার ছোটো একটি পরিচয় দিয়েছেন, অনুবাদে সে অংশটি নেই: 'ইংরেজ মহিলা, মার্গারেট নোবল, লণ্ডনের একটি স্কুলের পরিচালিকা, বিবেকানন্দকে যিনি নিবেদন করে দিয়েছিলেন নিজের জীবন।'

pathagar.net

৩৬ 'গৃহপালিতের মতো' কথাটি এখানে যথার্থ অনুবাদ নয়। ঠিক ঠিক অনুবাদ করলে বলতে হয় 'যে-কোনো-একটি কুকুরের মতো।' কিন্তু বাঙলা বাগ্‌বিধিতে কথাটায় ভিন্ন রঙ এসে যায় বলে একটু পালটে নেওয়াই ভালো মনে হলো।

নিঃসঙ্গ পুরুষ

১ মূল রচনা অনুযায়ী এই অধ্যায়ের সম্পূর্ণ শিরোনাম : পুন্তা চিকার নিঃসঙ্গ পুরুষ। সান ইসিদ্রোর সবচেয়ে উঁচু অঞ্চলটির নাম Punta Chica, আর এর কাছেই ছিল মিরালরিও, কবির আশ্রয়।

এটা আশ্চর্য যে ও-দেশের সাময়িকীতেও তখন লেখা হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের নিঃসঙ্গ মূর্তির পরিচয়। এই সঙ্গহীনতার একটা স্পষ্ট ছবি আমরা দেখতে পাই এল্‌ম্‌হার্স্টের বর্ণনা থেকে। তাঁর ভারতীয় জার্নালে রলাঁ জানিয়েছেন যে এল্‌ম্‌হার্স্টের কাছে তিনি শুনেছেন ওঁদের দক্ষিণ আমেরিকায় ভ্রমণের বৃত্তান্ত। রবীন্দ্রচরিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে তখন এল্‌ম্‌হার্স্ট তাঁকে বলেছেন : অনেক সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হতো যেন হিতৈষীরা তাঁকে ঘিরে ধরছেন চারদিক থেকে, হরণ করছেন তাঁর স্বাধীনতা। আর এই ভেবে বন্ধুজনের প্রতি তিনি হয়ে উঠতেন কেবলই সন্দিগ্ধ। অথচ মুখে কিছুই বলবেন না বলে এসব ভুল বোঝা দূর করবার উপায় নেই কোনো, আরো বেড়েই চলে এই দায়। তারপর হঠাৎ একদিন হয়তো ফেটে বেরোয় এতদিনের জমা চাপ, আর সে বিস্ফোরণ হতে পারে ভয়ংকর, এমনকী নিষ্ঠুর। পরে অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার ক্ষমাও চেয়ে নেবেন তিনি। এই সবকিছুরই অভিজ্ঞতা ছিল এল্‌ম্‌হার্স্টের নিজের। একদিন তাঁকে শুনতে হয়েছিল অনুতপ্ত মার্জনার্থী কবির এই কাতর স্বীকারোক্তি যে এইভাবেই একের-পর-এক বন্ধু হারিয়েছেন তিনি। কেউই ওঁকে পুরো বুঝতে পারে না তাই, আর এর

pathagar.net

দুঃখজনক ফল হলো এই যে তিনি একেবারে একা : Le resultat melancholique, c'est qu'il est seul !*

আর এই বেদনার ভূমিকায় দেখলে বোঝা যায় ভিক্টোরিয়াকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ওই চিঠির (১৩ জানুয়ারি ১৯২৫) সত্যিকারের মর্ম : 'I have lost most of my friends because they asked me for themselves, and when I said I was not free to offer myself they thought I was proud. I have deeply suffered from this over and over again – and therefore I always feel nervous whenever a new gift of friendship comes in my way. But I accept my destiny and if you also have the courage fully to accept it we shall ever remain friends.' উত্তরে জানালেন (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫) ভিক্টোরিয়া : 'You will never loose my friendship, no matter what happens and the more my heart gives to you, the more it has to give.'

২ *Fruit-Gathering*-এর ২০-সংখ্যক রচনা থেকে। এর মূল আছে 'কল্পনা' (১৯০০) কাব্যের 'রাত্রি' কবিতায় :

তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা।

৩ *Gitanjali*-র শততম রচনা, 'গীতাঞ্জলি'র ৪৭-সংখ্যক কবিতা :

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপরতন আশা করি।

---

* রল্যাঁর জার্নাল থেকে এল্‌ম্‌হার্স্টের এই মন্তব্যাংশ আমাকে জানিয়েছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য।
বইটির এই নতুন সংস্করণ ছাপা হবার সময়ে অবশ্য বেরিয়ে গেছে রল্যাঁর বইটির অনুবাদ। এই প্রসঙ্গে, এখন, তাই দেখা যেতে পারে শ্রীঅবন্তীকুমার সান্যালের অনুবাদ, 'ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী ১৯১৫-১৯৪৩', ১৯৭৬, পৃ ৮০-৮১।

pathagar.net

এখানে বলা দরকার যে ভিক্টোরিয়ার বইটিতে এ-অধ্যায়ের সূচনায় দ্বিতীয় এই উদ্ধৃতিটি নেই। এটি তিনি ব্যবহার করেছেন শতবার্ষিক সংগ্রহের 'নিঃসঙ্গ পুরুষ'-অধ্যায়ের সূচনায়। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির ধরনে এখানে দুটি উদ্ধৃতিই রইল।

৪ পত্রিকাটিতে রবীন্দ্রনাথ নাকি লিখেছিলেন: There are those who dream of shortening the road to success by using force in their desire to obtain liberty for man. Such people only succeed in forging for humanity a chain with infinite links of violence. The fastet way to illuminate one's own house is to set it on fire. But the immense splendor of this success is bought from the Prince of Darkness in exchange for the precipitous end of light.

রবীন্দ্রনাথ যখন দেশ ছেড়ে গেছেন এবার, তার কিছুদিন পর থেকে, অক্টোবর-নভেম্বর মাস জুড়ে ঢাকা শহর মথিত হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, দাঙ্গার আনুষঙ্গিক সমস্ত রকম শোচনীয়তায়। প্রতিবিধানের জন্য গান্ধীজী অনশন করছেন একুশ দিন, কাগজেপত্রে লেখালেখি চলেছে। অন্যদিকে, ২৪ অক্টোবর বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি করে অসংখ্য যুবককে গ্রেপ্তার করতে শুরু করেন সরকার। ঘরে ঘরে খোঁজখবর চলে বিপ্লবীদের অস্ত্র লুকোনো আছে কি না তা পরীক্ষা করবার জন্য। কোনো কোনো পত্রিকা বলছে এই অহেতুক লাঞ্ছনার জন্য 'দেশবন্ধু দাশ ও তাঁর দলের লোকদের অবিবেচনা ও অমিতভাষিতা' অন্তত কিছু পরিমাণে দায়ী (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩১, পৃ ২৬৫), মতিলাল নেহেরু ভাবছেন এই আইন রদ করবার জন্যে একটি বিল আনবেন ব্যবস্থাপক সভায়, আর গান্ধী বলছেন বিপ্লবীদের উচিত প্রাণদণ্ডের ঝুঁকি নিয়েও দোষ স্বীকার করা।

রবীন্দ্রনাথের কাছে এসব খবর পৌঁছল প্রায় দুমাস পর। আর খবর জেনে তিনি মিলিয়ে দেখলেন যে ঠিক সেই ২৪ তারিখেই গোলমাল শুরু

হয়েছিল তাঁর শরীরে, ওই দিনেই তিনি লিখেছিলেন 'ঝড়' আর 'পদধ্বনি' কবিতাদুটি। রলাঁকে বলেছেন এল্‌ম্‌হার্স্ট, ব্যাপারটিকে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন যেন টেলিপ্যাথির মতো।

Inde : Journal 1915-1943, Tagore, Gandhi, Nehru et les Problemes Indiens, Paris, 1951, pp. 55-56. শ্রীঅবন্তীকুমার সান্যাল অনূদিত 'ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী ১৯১৫-১৯৪৩', ১৯৭৬, পৃ ৫৭-৫৮।

রলাঁর এই মন্তব্যের সঙ্গে তুলনীয় ভিক্টোরিয়াকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই পত্রাংশ : 'My time in this country is constantly pelted with petty claims by numerous individuals, each of whom believes that he is the only one who deserves to be attended to. There is no escape from them unless I run away from India.' ২ অগস্ট ১৯২৫। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত চিঠি।

এরও প্রায় এক বছর আগে (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ : 'অসুস্থ শরীরে একদিন আমার তিন-তলার ঘরে অর্ধশয়ান অবস্থায় একটা লেখায় নিযুক্ত আছি। আমি নিতান্তই মৃদু স্বভাবের মানুষ বলেই আমার সেই অন্দরের ঘরটাকেও আমার বন্ধু, অনতিবন্ধু ও অবন্ধুরা দুর্গম বলে গণ্য করেন না। খবর এল, একটি ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। অস্বাস্থ্য বা ব্যস্ততার ওজরকে আমাদের ভদ্রলোকেরা শ্রদ্ধা করেন না, তাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লেখা বন্ধ করে নিচে গেলুম।...মানুষের ঘরে দরওয়াজা বন্ধ, এই কথাটিও কটু, আর তার ঘরে কোথাও পর্দা নেই এটাও বর্বরতা।' যাত্রী, ১৯৪৬, পৃ ২৩-২৪।

১৯৩২ সালের ২ অক্টোবর আবার এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন হেমন্তবালা দেবীকে : 'যাঁরা অবাধে যখন তখন আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন তাঁদের মধ্যে নগণ্যের সংখ্যা কম নয়—আমার সময় নই

হয়, কাজের ক্ষতি হয় স্বাস্থ্য পীড়িত হয় নিতান্ত অসাধ্য না হলে পদের অভিমানে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করিনে।' চিঠিপত্র ৯, ১৯৬৪, পৃ ১৬৯।

৭ অ্যাণ্ডরুজের কাছে এ-কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৯২০ সালে ৮ জুলাই, লণ্ডন থেকে। সম্পূর্ণ কথাটি ছিল এইরকম: 'I hope Pearson is furnishing you with all the news. He has been of very great help to me, as you can well imagine, and I find that the *ardous responsibility of looking after a poet* suits him wonderfully well.' *Letters to a Friend*, London, 1928, p. 86.

৮ মূল ফরাসি কথাটি এইরকম 'La perfection jette le froid'।

৯ চিঠিটির তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত চিঠিপত্র।

১০ ওকাম্পো-রবীন্দ্রনাথের যেসব চিঠিপত্র রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত, তার মধ্যে এটি দেখি নি।

১১ William Henry Hudson (1841-1922) রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় লেখক ছিলেন। এ-বিষয়ে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' বইতে: 'সমসাময়িক ইংরেজ লেখকদের মধ্যে ডব্লিউ. এইচ. হাডসন সম্বন্ধে বাবার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। মনে পড়ে দিদি আর আমি যখন বেশ ছোটো ছিলাম, আমাদের ইংরেজি জ্ঞান ছিল যৎসামান্য, বাবা হাডসনের ভ্রমণকাহিনী থেকে বাছা অংশ আমাদের পড়ে শোনাতেন। হাডসনের রচনার মধ্যে বাবার বিশেষ প্রিয় বই ছিল *The Naturalist in La Plata* ও *Green Mansions*। রোটেনস্টাইনও বাবার মতো হাডসনের অনুরাগী ছিলেন, তিনি উদ্‌যোগী হয়ে দুজনের মধ্যে আলাপ-পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন।...ব্যক্তিগত পরিচয়ের ফলে এই বিচিত্র মানুষটির সম্বন্ধে বাবার শ্রদ্ধা অনেকখানি বেড়ে যায়।' পৃ ১৫৬-৫৭। হাডসনের একটি বইয়ের উল্লেখ করে প্রিয়নাথ সেনকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৯০৪ সালের এপ্রিল মাসে: '*Idle days in Patagonia* যদি পড়ে থাক আমাকে পাঠিয়ো, আমি ওটা আমার Idle days in

Mazaffarpur-এর জন্য সংগ্রহ করে এনেছিলুম – যদি ঐ জাতের আর কোনো বই থাকে প্রবাসের জন্য আমাকে পাঠাতে পার?' চিঠিপত্র ৮, ১৯৬৩, পৃ ২০৯।

১২ *Inde : Journal 1915-1943.*

১৩ রলাঁ রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির উল্লেখ করেছেন তাঁর ডায়েরিতে, ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে। দ্র *Inde : Journal 1915-1943*, p. 71. ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী ১৯১৫-১৯৪৩, পৃ ৭৭।

এই চিঠির উত্তরে রলাঁ লিখেছিলেন (২৭ মার্চ ১৯২৫) রবীন্দ্রনাথকে : 'I don't think you should judge Ibero-Indian America by this annoying attempt. Of all these countries, Argentine is the most de-individualised. One ought to get into touch with the tragic soul (perhaps the most tragic of all our European races) of Mexico, of Indian Peru, and of Chili, – with that haughty 'Desolation', which is the title of a book of verses by one of the noblest interpreters of that tragedy, Gabriela Mistral.' *Rolland and Tagore,* 1945, p. 50.

১৪ 'ইওরোপীয় সংস্কৃতি কি আমাদের নিজেদেরই নয়?' এ অধ্যায়ে ভিক্টোরিয়ার এই মন্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা উচিত তাঁর পরবর্তী-অধ্যায়ের এই কথা : 'ইওরোপ থেকে একদিন হয়তো নিজেদের মুক্ত করে নিয়ে দাঁড়াতে পারব' অথবা ইওরোপের কাছে 'আমাদের প্রত্যাশিত পরিপোষণ পাই না একেবারেই।'

সাম্প্রতিক কালের আর্জেন্টিনার নামী লেখক বোর্হেস অবশ্য মনে করেন যে ইওরোপীয় সংস্কৃতিই তাঁদের নিজস্ব সম্পদ : 'The Argentine Writer and Tradition' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : 'I believe our tradition is all of Western culture, and I also believe we have a right to this traditon, greater than

pathagar.net

that which the inhabitants of one or another Western nation might have.' *Labyrinths*, New York, 1964, p. 184.

১৫ রবীন্দ্রনাথের মতো পর্যটকেরা লাতিন আমেরিকার বিষয়ে অল্পই জানতেন, অল্পই একে বুঝতে পারতেন: ভিক্টোরিয়ার এই অভিযোগ বস্তুত রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালের ১৩ জানুয়ারি 'জুলিয়ো চেজারে' জাহাজ থেকে তিনি লিখছেন ভিক্টোরিয়াকে: 'I am not a born traveller—I have not the energy and strength needed for knowing a strange country and helping the mind to gather materials from a wide area of new experience for building its foreign nest.···For me the spirit of Latin America will ever dwell in my memory incarnated in your person.' রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত চিঠিপত্র থেকে।

১৬ Ricardo Guiraldes (1886-1927)। এঁর যে বিখ্যাত উপন্যাসটির কথা বলছেন ভিক্টোরিয়া, তার নাম *Don Segundo Sombra* (1926)। শতবার্ষিক সংগ্রহের লেখাটিতে ভিক্টোরিয়া এঁর বিষয়ে আরো খানিকটা বলেছেন: 'The hero of *Don Segundo Sombra* is a "gaucho", a man of the "pampas" (our great prairies). It is dedicated to "gauchos" of the Guiraldes country place in the province of Buenos Aires. Ricardo was a poet and a novelist who, at the time I introduced him to Tagore had not yet achieved the renown which was unexpectedly to descend on him three or four years later, on the eve of his death.' *Rabindranath Tagore, A Centenary Volume 1861-1961*, Sahitya Akademi, p. 37.

১৭ Facultad de Filosofia y Letras: School of Philosophy and Letters.

১৮ Juan Jose Castro আর তাঁর ভাই Jose Maria Castro বিষয়ে

pathagar.net

শতবার্ষিক সংগ্রহের প্রবন্ধটিতে এই পরিচয় বলা আছে : Juan Jose Castro is today one of our foremost composers. His opera "Proserpina and the Stranger" was awarded the International La Scala prize given in commemoration of the 50th anniversary of Verdi's death, Stravensky and Honnegar being on the juri. An outstanding conductor, he is at present at the head of the National Orchestra of the Buenos Aires Colon Theatre, our opera house where, during the last fifty years, all the world-famous singers and musicians have performed. His brother, Jose Maria Castro, is also a distinguished composer. *Ibid*, p. 37.

১৯ 'জীবনস্মৃতি'র (১৯১২) এই কাহিনীটি লেখিকা বর্ণনা করছেন তাঁর স্মৃতি থেকে। মূল থেকে দু'একটি অংশ তাই ভিন্ন হয়ে গেছে। যেমন, 'লেমনেড বা ঐ জাতীয় কিছু' খাবার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেন নি।

'জীবনস্মৃতি'র বর্ণনা এইরকম :

সাতটার সময় যেখানে পৌছিবার কথা সেখানে পৌছিতে সাড়ে-নয়টা হইল। গৃহকর্ত্রী কহিলেন, 'এ কী রুবি, ব্যাপারখানা কী।' আমি আমার আশ্চর্য ভ্রমণবৃত্তান্তটি খুব-যে সগর্বে বলিলাম তাহা নয়।

তখন সেখানকার নিমন্ত্রিতগণ ডিনার শেষ করিয়াছেন। আমার মনে ধারণা ছিল যে, আমার অপরাধ যখন স্বেচ্ছাকৃত নহে তখন গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে না—বিশেষত রমণী যখন বিধানকর্ত্রী। কিন্তু উচ্চপদস্থ ভারতকর্মচারীর বিধবা স্ত্রী আমাকে বলিলেন, 'এসো রুবি, এক পেয়ালা চা খাইবে।' আমি কোনোদিন চা খাই না কিন্তু জঠরানল নির্বাপণের পক্ষে পেয়ালা যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে মনে করিয়া গোটাকয়েক চক্রাকার বিস্কুটের সঙ্গে সেই কড়া চা গিলিয়া ফেলিলাম। বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি প্রাচীনা নারীর সমাগম

হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন সুন্দরী যুবতী ছিলেন, তিনি আমেরিকান এবং তিনি গৃহস্বামিনীর যুবক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহের পূর্বে পূর্বরাগের পালা উদ্‌যাপন করিতেছেন। ঘরের গৃহিণী বলিলেন, 'এবার তবে নৃত্য শুরু করা যাক।' আমার নৃত্যের কোনো প্রয়োজন ছিল না এবং শরীর মনের অবস্থাও নৃত্যের অনুকূল ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত ভালোমানুষ যাহারা জগতে তাহারা অসাধ্যসাধন করে। সেই কারণে যদিচ এই নৃত্যসভাটি সেই যুবকযুবতীর জন্যই আহূত, তথাপি দশঘণ্টা উপবাসের পর দুইখণ্ড বিস্কুট খাইয়া তিনকাল-উত্তীর্ণ প্রাচীন রমণীদের সঙ্গে নৃত্য করিলাম।

এইখানেই দুঃখের অবধি হইল না। নিমন্ত্রণকর্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কবি, আজ তুমি রাত্রিযাপন করিবে কোথায়।' এ প্রশ্নের জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি হতবুদ্ধি হইয়া যখন তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম তিনি কহিলেন, 'রাত্রি দ্বিপ্রহরে এখানকার সরাই বন্ধ হইয়া যায়, অতএব আর বিলম্ব না করিয়া এখনই তোমার সেখানে যাওয়া কর্তব্য।' সৌজন্যের একেবারে অভাব ছিল না—সরাই আমাকে নিজে খুঁজিয়া লইতে হয় নাই। লণ্ঠন ধরিয়া একজন ভৃত্য আমাকে সরাইয়ে পৌঁছাইয়া দিল।

মনে করিলাম, হয়তো শাপে বর হইল—হয়তো এখানে আহারের ব্যবস্থা আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমিষ হউক, নিরামিষ হউক, তাজা হউক, বাসি হউক, কিছু খাইতে পাইব কি। তাহারা কহিল, মদ্য যত চাও পাইবে, খাদ্য নয়। তখন ভাবিলাম, নিদ্রাদেবীর হৃদয় কোমল, তিনি আহার না দিন বিস্মৃতি দিবেন। কিন্তু তাঁহার জগৎজোড়া অঙ্কেও তিনি সে-রাত্রে আমাকে স্থান দিলেন না। বেলে পাথরের মেজেওয়ালা ঘর ঠাণ্ডা কন্‌কন্ করিতেছে; একটি পুরাতন খাট ও একটি জীর্ণ মুখ ধুইবার টেবিল ঘরের আসবাব।

সকালবেলায় ইঙ্গভারতী বিধবাটি প্রাতরাশ খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইংরেজি দস্তুরে যাহাকে ঠাণ্ডা খানা বলে তাহারই

pathagar.net

আয়োজন। অর্থাৎ, গতরাত্রির ভোজের অবশেষ আজ ঠাণ্ডা অবস্থায় খাওয়া গেল। ইহারই অতি যৎসামান্য কিছু অংশ যদি উষ্ণ বা কবোষ্ণ আকারে কাল পাওয়া যাইত তাহা হইলে পৃথিবীতে কাহারও কোনো গুরুতর ক্ষতি হইত না— অথচ আমার নৃত্যটা ডাঙায়-তোলা কইমাছের নৃত্যের মতো এমন শোকাবহ হইতে পারিত না।

আহারান্তে নিমন্ত্রণকর্ত্রী কহিলেন, 'যাহাকে গান শুনাইবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি তিনি অসুস্থ, শয্যাগত, তাঁহার শয়নগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমাকে গাহিতে হইবে।' সিঁড়ির উপর আমাকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। রুদ্ধদ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গৃহিণী কহিলেন, 'ওই ঘরে তিনি আছেন।' আমি সেই অদৃশ্য রহস্যের অভিমুখে দাঁড়াইয়া শোকের গান বেহাগ রাগিণীতে গাহিলাম, তাহার পর রোগিণীর অবস্থা কী হইল সে সংবাদ লোকমুখে বা সংবাদপত্রে জানিতে পাই নাই।

জীবনস্মৃতি, ১৯৬২, পৃ ৯৫-৯৬।

২০ Claude Achille Debussy (1862-1918)।
Joseph Maurice Ravel (1875-1937)।
Alexander Porfirevich Borodin (1834-87)।

২১ জীবনস্মৃতি, ১৯৬২, পৃ ১০৫।

২২ ১৯২৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে লেখা ভিক্টোরিয়ার এই পত্রাংশটি এখানে তুলনীয়: 'Did they send the photos to India ? I addressed them to Genoa (American Express). Those photos were taken in the Guiraldes Estancia. It does not look English as Chapadmalal, does it ?' রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত চিঠিপত্র থেকে।

২৩ Pedro Figari (1861-1938), উরুগুয়ের চিত্রশিল্পী। স্মরণীয় যে ইনিও ছবি আঁকতে শুরু করেন ষাট বছর বয়সের পর।

২৪ যে-বইটির কথা এখানে বলা হচ্ছে তার নাম *Far Away and Long Ago* (1918)। হাডসন প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ের ১১-সংখ্যক সূত্রটি দ্রষ্টব্য।

pathagar.net

২৫ এই চিঠির তারিখ ১৩ জানুয়ারি ১৯২৫।

২৬ এই প্রসঙ্গে এ-অধ্যায়ের ১৩-সংখ্যক সূত্রটি দ্রষ্টব্য।

২৭ ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে লেখা এই চিঠি। 'পূরবী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা ('আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা') তিনি জানাচ্ছেন বইটি ছাপা হবার চোদ্দ বছর পর, এটা লক্ষ করবার বিষয়।

২৮ ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হলো 'পূরবী', উৎসর্গপত্রে লেখা হলো 'বিজয়ার করকমলে'। এর অন্তর্গত উনত্রিশটি কবিতা লেখা হয় আর্জেন্টিনার তীরে পৌছবার পর, ওই দেশে বসে। জাহাজ থেকে নামবার আগেই তার তিনটি রচনা। আর্জেন্টিনা ছাড়বার পর, জুলিয়ো চেজারে জাহাজে বসে ফিরতি পথে লেখা 'মিলন' (৯ জানুয়ারি ১৯২৫) কবিতাটিতেও ভিক্টোরিয়ার অনুষঙ্গ হয়তো কিছু ছিল।

অনেক পরবর্তী একটি চিঠিতে (১০ জুলাই ১৯৪০) রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়াকে 'পূরবী' নামটি বোঝাবার চেষ্টা করছেন এইভাবে: 'It is named Purabi (the East in its feminine gender)'। এর এক মাস আগে (৮ জুন) ভিক্টোরিয়া জানতে চেয়েছিলেন: 'Now, tell me, what is the title of the poetry book you dedicated to me?' সাম্প্রতিক একটি রচনায় একজন লিখেছেন: 'শ্রীমতী ওকাম্পো আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল তো পূরবী কথার মানে কী? আমার পক্ষে এক কথায় এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব মনে হলো। বললাম, পূরবী কথাটার কয়েকটা মানে আছে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে পূর্ব বা পূরব শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ পূরবী। আর ভারতীয় সংগীতের অন্যতম রাগিণীর নাম পূরবী। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এই রাগিণীটির তাৎপর্য কী। বললাম,...সন্ধ্যাকালীন রাগিণী। সন্ধ্যাকালটি আমাদের মনে একটা বিদায়ের সুর সূচিত করে।...পূরবীর সুরে সমাপ্তির এই বিদায় ব্যথাটিই মানুষের মনে অনুরণিত হয়ে ওঠে। শ্রীমতী ওকাম্পো বললেন, বুঝলাম, কিন্তু তবে এই রাগিণীকে পূরবী না বলে পশ্চিমী বললেই তো তার সার্থকতা বজায় থাকত।' শ্রীজ্যোতির্ময় মৌলিক,

'বিজয়ার করকমলে', আনন্দবাজার পত্রিকা ২৫ বৈশাখ ১৩৭৭।
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা ভালো যে 'পূরবী' কাব্যে আছে দুটি ভিন্ন অংশ : 'পূরবী' আর 'পথিক'। রবীন্দ্রনাথের আর্জেন্টিনার রচনাবলি 'পথিক' অংশের অন্তর্গত।

২৯ এ-চিঠির তারিখ ২৯ অক্টোবর ১৯২৫।

৩০ শ্রীক্ষিতীশ রায় (১৯১১) যখন রবীন্দ্রসদনে নিযুক্ত ছিলেন, 'পূরবী' থেকে নির্বাচিত কয়েকটি কবিতার অনুবাদ করেন তিনি *Poems from Puravi* (1960) নামে। 'শেষ লেখা'র পঞ্চম কবিতাটি আর 'পূরবীর' পূর্ণতা, বিদেশী ফুল, অন্তর্হিতা, আশঙ্কা, শেষ বসন্ত, বদল এই কটি রচনা অনূদিত হয়। এ-অনুবাদ হয়তো ভিক্টোরিয়ার আক্ষেপ দূর করেছিল, যে-আক্ষেপে তিনি একদিন লিখেছিলেন : 'But it is quite impossible for me to go on looking at the book and not being able to know what is inside those pages. What can I do ?...The book you sent me is my greatest treasure, but I am mad to know what is inside it.' ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৫। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত চিঠিপত্র থেকে।

৩১ John Galsworthy (1867-1933) প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লেখকসঙ্ঘ P. E. N. (Poets Playwrights Essayists Editors Novelists)-এর প্রথম অধিবেশন ছিল লণ্ডনে, ১৯২৩ সালে। ১৯৩৬ সালে বুয়েনস আইরেসের অধিবেশনে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো।

৩২ এই প্রসঙ্গে ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তা চলছিল এই রকম : ভিক্টোরিয়া : Kalidas Nag and Mrs. Sophia Wadia were here for the P. E. N. Club and I can't hear about India or meet Indian people without thinking of you because you are and always will be India to me. 1936 October 3.

pathagar.net

রবীন্দ্রনাথ : Dr. Kalidas Nag came to see me when he was about to leave for Argentina and I felt a real grievance against your people for not asking me to come. I assure you I would have responded at once if they had done it. 1936 Oetober 19.

ভিক্টোরিয়া : I have just received your letter and am so very sorry we did not think you would be willing to come to the P. E. N. Congress this September. 1936 December 2.

রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত চিঠিপত্র থেকে।

৩৩ এই মন্তব্য আছে রলাঁর *Inde : Journal*-এর মধ্যে। ওকাম্পো বলছেন, সেপ্টেম্বর। বস্তুত, রলাঁ এটা লিখেছেন জুন মাসে : 'রবীন্দ্রনাথ নিজের দেশে বিচ্ছিন্ন। যুবসম্প্রদায় তাঁর দিক থেকে পুরোপুরি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।' দ্র. শ্রীঅবন্তীকুমার সান্যালের অনুবাদ, 'ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী ১৯১৫-১৯৪৩', পৃ ২৭১।

১৯৩০-এর অনেক আগে থেকেই এ-ধরনের কথা অবশ্য রলাঁ ভাবতে শুরু করেছিলেন। যেমন, একটি চিঠিতে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথকে : 'But I know quite well that in India you also are isolated enough.' ২রা মার্চ ১৯২৩। *Rolland and Tagore*, p. 37. অথবা, আরো পূর্ববর্তী দিনের প্রসঙ্গে : '...when the independence movement took on a violent character, the poet left it and retired to Santiniketan. He was a lost leader, and Indian nationalists have never forgiven him.' *Prophet of the New India*, tr. E. F. Malcolm-Smith, London, 1930, pp. 498-99.

৩৪ 'গান্ধী তাঁর কাছ থেকে শুধুমাত্র সমস্ত প্রাণশক্তিই কেড়ে নেন নি ; তাঁর মহৎ উপন্যাসগুলোও প্রাচীন হয়ে গেছে ; "ঘরেবাইরে"র মতো বইয়ের

pathagar.net

মধ্যে আজকের ভারতবর্ষ আর নিজেকে খুঁজে পায় না ; এ যে-সামাজিক অবস্থা নিয়ে লেখা তা ইতিমধ্যেই অতীতের বস্তু হয়ে গেছে ; তারপর থেকে রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ নবীকরণ হয়নি।' ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী ১৯১৫-১৯৪৩, পৃ ২৭১।

৩৫ Edward Morgan Forster (1879-1970), *A Passage to India* (1924)।

৩৬ টলস্টয়ের খ্যাত উপন্যাস *Voyna i Mir* (1862-69)।

৩৭ শতবার্ষিক সংগ্রহের রচনাটিতে এই বন্ধুদের বিষয়ে আরো একটি বাঁক মন্তব্য আছে ভিক্টোরিয়ার : 'Swiss Romain Rolland's earnest and virtuous French friends I imagine.' *Rabindranath Tagore, A Centenary Volume 1861-1961*, Sahitya Akademi, p. 39. এই প্রসঙ্গে আরো দ্রষ্টব্য, ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী ১৯১৫-১৯৪৩, পৃ ২৭৭-৮১।

৩৮ ইওরোপে রওনা হন রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালের মার্চ, মার্সাই পৌঁছলেন ২৬ মার্চ। সেখানে থেকে যান সমুদ্রতীরবর্তী সুন্দর অঞ্চল Cap Martin। কাপ মার্ত্যাঁ থেকে পারী।

৩৯ এখানে মনে রাখা উচিত যে এই ছোটো খাতাটির আগেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর আঁকিবুঁকিকে একটা রূপ দেবার চেষ্টা করতেন।

এ সব রূপ থেকে যে ছবির সৃষ্টি হলো তা একদিকে যেমন বন্দনা পেয়েছে, অন্যদিকে তেমন কিছু উপহাসও যে অর্জন করেছে সে-তথ্যও মনে রাখা ভালো। পরিণত বয়সে Ezra Pound (1885-1972) বলেছিলেন একবার : 'I remember when Tagore had taken to doodling on the edge of his proofs, and they told him it was art. There was a show of it in Paris. "Is this art ?" Nobody was very keen on these doodlings, but of course so many people lied to him.' *Writers at Work*, 2nd Series, ed. Van Wyck Brooks, New York, 1966, p. 43.

রলাঁ-ও লিখেছেন: 'ছবিগুলো ইউরোপে যে অভ্যর্থনা পেয়েছে, তাতে তিনি বুঁদ হয়ে আছেন। এর মধ্যে স্বাবারি ও মিথ্যা ভদ্রতার অংশ যে কতখানি তা তিনি ধরে উঠতে পারেন নি।' ভারতবর্ষ: দিনপঞ্জী, ১৯১৫-১৯৪৩, পৃ ২৮০।

৪০ কাপ মার্ত্যাঁ থেকে রোটেনস্টাইনকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ১৯৩০ সালের ৩০ মার্চ: 'I have suddenly been seized with the mania of producing pictures. The praise which they had won from our own circle of artists I did not take at all seriously till some of them attracted notice of a Japanese artist of renown whose appreciation came to me as a surprise. Some European painters who lately visited our *Ashram* strongly recommended me to have them exhibited in Berlin and Paris. Thus I have been persuaded to bring them. I still feel misgivings and I want your advice. They certainly possess pshychological interest being products of untutored fingers and untrained mind. I am sure they do not represent what they call Indian Art, and in one sense they may be original, revealing a strangeness born of my utter inexperience and individual limitations.' Mary M. Lago, *Imperfect Encounter*, Harvard University Press, 1972, p. 326. ছবির প্রতি আকস্মিক এই উন্মুখতার সঙ্গে কবির আর্জেন্টিনা-জীবনের কিছুটা সম্পর্ক আছে সন্দেহ নেই। নিছক রেখা থেকে সরাসরি ছবির দিকে এগিয়ে আসার ব্যাপারে ভিক্টোরিয়ার উৎসাহ অনেকটা ক্রিয়াশীল ছিল মনে হয়। ভিক্টোরিয়া একবার বলেছেন: '...তাঁর একটা বিরাট অঙ্কনশক্তি আবিষ্কার করেছিলাম। সেদিন কবিকে চিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশ করতে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিলাম। কবি চুপ করে আমার

কথা শুনলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। কয়েকদিন পর তিনি আমাকে বললেন, বিজয়া, তোমার উৎসাহে আমি এ-কাজে প্রবৃত্ত হব, তবে তুলি দিয়ে আমি ছবি আঁকব না। যে কলম দিয়ে কথার কাব্য লিখি সেই কলমে রঙ এবং রেখার কাব্য লিখতে পারি কি না, তারই একটা পরীক্ষা চালাতে চাই।' শ্রীজ্যোতির্ময় মৌলিক, 'বিজয়ার করকমলে', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ বৈশাখ ১৩৭৭।

৪১ ভিক্টোরিয়াকে টেলিগ্রাম করছেন রবীন্দ্রনাথ : 'Will you not come and see me Villa Dunure Cap-Martin'।

৪২ George Henry Riviére। এঁর বিষয়ে রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন (১৫ জুলাই ১৯৩০) রবীন্দ্রনাথ : 'একখানা খুব ভালো landscape—যেটা দেখে Riveree চমকে উঠেছিল হারিয়েচে। বোধ হচ্ছে যেন ঘাটে ঘাটে ছবি খোওয়াতে খোওয়াতে যেতে হবে।' চিঠিপত্র ২, ১৯৪২, পৃ ৯৩।

৪৩ Galarie Pigalle। প্রদর্শনী উদ্‌বোধনের তারিখ ছিল ১৯৩০ সালের ২ মে। প্রতিমা দেবীকে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ : 'আজ বিকেলে প্রথমে দ্বারোদ্‌ঘাটন হবে—তারপর কী হয় সেইটেই দ্রষ্টব্য।' চিঠিপত্র ৩, ১৯৪২, পৃ ৯৬।

৪৪ Comtesse Anna-Elisabeth Brancovan de Noailles (1876-1933) এই চিত্রসূচির মুখবন্ধে লেখেন : '…বিস্ময়কর এই সৃষ্টিগুলি, যা একাধারে চোখ জুড়োয় আর আমাদের টেনে নিয়ে চলে বহু দূরের সেই সব দেশে, যেখানে কাল্পনিক বস্তুই বাস্তবের চেয়ে বেশি করে বাস্তব, ভেবে চমৎকৃত হতে হয় কী করে যুক্তিবাদী স্বপ্নপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ এই সৃষ্টির দ্বার খুলে দিলেন। বুনো পায়রার মতো নমনীয় যে-হাতে তিনি কবিতা লিখতেন, সেই হাতই তাঁর পাণ্ডুলিপির মার্জিনে খুঁজে পেল হঠাৎ, অব্যক্তের আনন্দসুরায় মাতাল হয়ে, ক্ষুরস্য ধার রচনার বিধিনিষেধ থেকে অনেক অনেক দূরের এক জগৎ যেখানে কল্পনার অদম্য শক্তিই সর্বেসর্বা।…' শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ, ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৭৪-৭৫।

pathagar.net

৪৫ লণ্ডনে ছবির প্রদর্শনী শুরু হলো ৪ জুন, বার্লিনে ১৬ জুলাই। এর আগের দিন রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ: 'ছবিগুলোরও কপাল ভালো বলেই মনে হচ্চে। এখানকার খুব বিখ্যাত আর্টিস্ট Kathe Kollwitz খুবই বিস্মিত হয়েছেন। গ্যালারি-ওয়ালারা বলচে, একেবারে আশাতীত। ড্রেসডেনে, ম্যুনিকে একজিবিশনের প্রস্তাব চলচে।' চিঠিপত্র ২, ১৯৪২, পৃ ৯২।

প্রতিমা দেবীকে লিখছেন: 'এখানকার ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে আমার পাঁচখানা ছবি নিয়েচে শুনেচ। তার মানে তারা পৌঁচেচে ছবির অমরাবতীতে। ওরা দামের জন্য ভাবছিল—টাকা নেই কী করবে। আমি লিখে দিয়েছি যে আমি জর্মানিকে দান করলুম দাম চাইনে। ভারি খুসি হয়েচে। আরো অনেক জায়গা থেকে একজিবিশনের জন্য আবেদন আসচে। একটা এসেচে স্পেন থেকে—তারা চায় নবেম্বরে। ভিয়েনা চায় ইত্যাদি ইত্যাদি।' চিঠিপত্র ৩, ১৯৪২, পৃ ৮২-৮৩।

শ্রীমতী রানী মহলানবীশকে: 'আজ আমার জর্মানির পালা সাঙ্গ হলো, কাল যাব জেনিভায়। এ পত্র পাবার অনেক আগেই জানতে পেরেছ যে জর্মানিতে আমার ছবির আদর যথেষ্ট হয়েছে। বার্লিন ন্যাশন্যাল গ্যালারি থেকে আমার পাঁচখানা ছবি নিয়েছে। এই খবরটার দৌড় কতকটা আশা করি তোমরা বোঝো। ইন্দ্রদেব যদি হঠাৎ তাঁর উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া পাঠিয়ে দিতেন আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যে তাহলে আমার নিজের ছবির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতুম।' পথে ও পথের প্রান্তে, ১৯৫১, পৃ ১১১।

এর সঙ্গে তুলনীয় রলাঁর মন্তব্য: 'আর বার্লিনে আর্ট গ্যালারির জন্য সরকার থেকে তাঁর তিন চারখানা ছবি কেনা হয়েছে। তিনি উল্লসিত। একথা বলতে তাঁর ভয় হলো না: জগতে আর যা কিছুই ঘটুক আমার তাতে আগ্রহ নেই। এখন আমি আমার সত্যিকারের সুখ খুঁজে পেয়েছি।...' ভারতবর্ষ: দিনপঞ্জী ১৯১৫-১৯৪৩, পৃ ২৮০।

৪৬ Paul Valery (1871-1945)।

৪৭ Jean Cassou (1897)।

৪৮ Abbé Henri Bremond (1865-1933)।

৪৯ Eanard a l'orange।

৫০ ছবি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন ইওরোপে চলেছেন, ইওরোপের নানা শহরে ছবির প্রদর্শনী যখন চলছে, তার সমসময়ে দেশের ভিতর দেখা দিচ্ছে একের-পর-এক নূতন উত্তেজনা। আইন অমান্য করে আন্দোলনের ঘোষণা করেন গান্ধীজী ১২ মার্চ। সবরমতী আশ্রম থেকে ৭৯ জন সহকর্মী নিয়ে তাঁর পদযাত্রা শুরু হয়। লবণ আইন ভঙ্গ করে ৬ এপ্রিল ডাণ্ডি উপকূলে তিনি সমুদ্রজল থেকে লবণ প্রস্তুত করেন। ওদিকে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন ১৮ এপ্রিল। জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে গান্ধীজী কারারুদ্ধ হন ১৫ মে। ঠিক সেইদিন হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হয় ঢাকায়। এর কদিন আগে ৮ মে অন্য ধরনের এক দাঙ্গা দেখা দিল শোলাপুরে। 'মার্শাল ল' জারি করে মিলিটারি কোর্ট তিনজন রাজনৈতিক কর্মীকে ফাঁসি দেয় এর ফলে।

এটা নিশ্চয় বলা যায় যে, 'ভারতবর্ষে তখন একটা নাটকীয় উত্তেজনার সময় চলছে।'

৫১ শিল্পের প্রতি উন্মুখতাকে এই যে 'চপলতা' বলে নিন্দে করেছিলেন রলাঁ, সেই প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'আত্মপরিচয়' (১৯৪৩) বই থেকে কয়েকটি লাইন: 'আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি—যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহেতুক আনন্দে অধীর আমরা তাঁরই দূত।...বিশ্বে বিচিত্রের লীলায় নানা সুরে চঞ্চল হয়ে উঠেছে নিখিলের চিত্ত, তারই তরঙ্গে বালকের চিত্ত চঞ্চল হয়েছিল, আজও তার বিরাম নেই। সত্তর বৎসর পূর্ণ হলো, আজও এ চপলতার জন্য বন্ধুরা অনুযোগ করেন, গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটে। কিন্তু বিশ্ব-কর্মার ফর্মাশের যে অন্ত নেই। তিনি যে চপল, তিনি যে বসন্তের অশান্ত সমীরণে অরণ্যে অরণ্যে চিরচঞ্চল।' আত্মপরিচয়, ১৯৬১, পৃ ৭৩-৭৪।

লক্ষণীয় যে এই মন্তব্য করেন রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১ সালের মে মাসে। আর,

pathagar.net

রলাঁর সমালোচনা ছিল তার আগের বছরের জুনে।

৫২ ঠিক এইভাবেই বলছেন রবীন্দ্রনাথ 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে: 'হে চিরপ্রচ্ছন্ন, আমার মধ্যে যা-কিছু তুমি তোমার গভীরের ভিতর থেকে তারার মতো প্রকাশ করেছ রূপে ও বাণীতে, তাতেই নিত্যকালের অমৃত; আমি খুঁজে খুঁজে পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে কীর্তির যে-জয়স্তম্ভ গেঁথেছি, কালস্রোতের ভাঙনের উপরে তার ভিত।' ১২ ফেব্রুয়ারি-১৯২৫। যাত্রী, ১৯৪৬, পৃ ১১৮।

ভালোবাসা

১ ভালোবাসা: এই মূল বাঙলা শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে এ-অধ্যায়ের শিরোনাম হিসেবে। শতবার্ষিক সংগ্রহের রচনাটিতে ভিক্টোরিয়া লিখেছেন: 'During his stay at San Isidro, Tagore taught me a few words of Bengal. I have retained only one, which I shall always repeat to India: Bhalobasa'. *Rabindranath Tagore, A Centenary Volume 1861-1961*, Sahitya Akademi, p. 47.

ভিক্টোরিয়ার কাছে লেখা চিঠির শেষে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সব সময়েই ব্যবহার করতেন এই শব্দটি, কখনো বাঙলা হরফে কখনো রোমান হরফে।

২ *Gitanjali*-র প্রথম কবিতা। বাঙলা মূল আছে 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) বইটির ২১-সংখ্যক রচনায়:

আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনই লীলা তব।

৩ Paquin Company।

৪ শান্তিনিকেতন থেকে লিখছেন (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬) রবীন্দ্রনাথ; 'The photograph I am sending you was taken yesterday,

pathagar.net

but the robe belongs to the time when I was with you in San Isidro. It was your gift.' রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত চিঠিপত্র থেকে।

৫ জীবনস্মৃতি, ১৯৬২, পৃ ১০০-১০১।

৬ তদেব, পৃ ১২৬।

৭ তদেব, পৃ ৭১।

৮ ছিন্নপত্র, ১৯৬০, পৃ ২৮০-৮১। আত্মপরিচয়, ১৯৬১, পৃ ৫৩।

৯ '…in modern churches, selfishness, hatred and vanity in their collective aspect of national instincts do not scruple to share the homage paid to God.' *Creative Unity*, 1922, p 149.

১০ 'বিজয়ার অলিন্দে' অংশের ৯-সংখ্যক সূত্রে দ্রষ্টব্য।

১১ Saint-John Perse (1887-1975)। Alexis Saint-Leger Leger-এর ছদ্মনাম। ভিক্টোরিয়া এই লাইনটি ব্যবহার করেছেন তাঁর *Exil* (1944) কাব্যের পঞ্চম অধ্যায় থেকে: Me voici restitute a ma rive natale. Il n'est d'histoire que de l'ame, *Il n'est d'aisance que de l'ame*। বাঁকানো হরফের অংশটুকু ভিক্টোরিয়া উল্লেখ করেন নি তাঁর রচনায়।

১২ চাপাদমালালে দুটি কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ; 'আকন্দ' আর 'কঙ্কাল'। 'কঙ্কাল' রচনাটিরই কি অনুবাদ শুনিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়াকে? 'একটা জগৎ খুলে গেল আমার সামনে': ভিক্টোরিয়ার এই প্রতিক্রিয়া থেকে সেইরকম অনুমান হয়।

১৩ 'পূরবী'র কবিতাগুলির তারিখ দেখে বোঝা যায়, চাপাদমালালে কবির অবস্থান আট দিনের বেশি নয়; ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিলেন তিনি সান ইসিদ্রোতে, ফিরে এসেছেন আবার ২০ তারিখের মধ্যেই।

১৪ *Les Fleurs de Mal* (*1857*)।

১৫ *L'Invitation au Voyage* কবিতার এক টুকরো। এখানে ব্যবহার

pathagar.net

করা হলো বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ, 'শার্ল বোদলেয়ার; তাঁর কবিতা' (১৯৬১) বইটি থেকে। ভিক্টোরিয়া উল্লেখ করেছেন এর মূল:

Des meubles luisants
Polis par les ans
Décoreraient notre chambre;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l'ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale···

১৬ এরপর কখনো কখনো এই কবিতার উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিপত্রে।

'I pass most part of my day and a great part of my night deeply buried in your armchair which, at last, has explained to me the lyrical meaning of the poem of Baudelaire that I read with you.' ৫ জানুয়ারি ১৯২৫।

উত্তরে ভিক্টোরিয়া লিখেছিলেন: 'So at last you understood Baudelaire through my armchair!···I hope that you may understand, through that same piece of furniture. what the lyrical meaning of my devotion is!' ১৫ জানুয়ারি ১৯২৫।

রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত চিঠিপত্র থেকে।

১৭ ১৯৩১ সাল থেকে *Sur* পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, ভিক্টোরিয়ার সম্পাদনায়।

১৮ শেষ দেখা হওয়ার সময় সম্পর্কে ভিক্টোরিয়ার এই উল্লেখ হয়তো নির্ভুল নয়। রবীন্দ্রনাথ পারী ছেড়েছিলেন ১১ মে, দুমাস ছিলেন ইংল্যাণ্ডে,

pathagar.net

১১ জুলাই পৌঁছন বার্লিনে। তাই, পারীর Gare du Nord রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে রবীন্দ্রনাথকে ভিক্টোরিয়া শেষবারের মতো দেখেন হয়তো মে মাসেই, জুনে নয়।

১৯ E. W. Aryanayakam (1889-1967)।
পূর্বতন নাম ছিল E. Ariam Williams। ১৯৩০ সালের বিদেশ-ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি হিসেবে তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

২০ রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে এই চেয়ারটির আরো কিছু উল্লেখ এইরকম :
'I shall completely have to surrender myself to your easy chair which has followed me from shore to shore.' ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫।
'I am writing this, reclining on your armchair, which, I am afraid, will keep me within its enclosure much longer than what I calculated.' ৪ মার্চ ১৯২৫।
'I am pinned to my chair.' ৩১ মার্চ ১৯২৫।
'তোমার চেয়ার' এই চিঠিতেই প্রথম 'আমার চেয়ার' হলো।

২১ এ চিঠির তারিখ ৫ জানুয়ারি ১৯২৫।

২২ অর্তেগা-ই-গ্যাসেটকে এক মার্কিন যুবতী বলেছিলেন একবার : 'আমাকে নারী হিসেবে দেখবেন না, মানুষ বলে ভাববেন।' শুনে অর্তেগা তাঁকে সবিনয়ে জানান যে মানুষ নামে কাউকে তিনি জানেন না, তিনি জানেন যে কিছু আছে পুরুষমানুষ আর কিছু আছে মেয়েমানুষ। কেন তিনি তা ভাবেন, সেকথা বোঝাবার জন্য মেয়েদের বিষয়ে দীর্ঘ দার্শনিক বিশ্লেষণ করেছেন অর্তেগা তাঁর More about others and I প্রবন্ধে। দ্র *Man and People*, tr. W. R. Trask, New York, 1957, pp. 130-38.

২৩ ৫ জানুয়ারি ১৯২৫-এর চিঠি।

২৪ ভিক্টোরিয়া নিজের ভাষাভঙ্গিতেই একথা লিখছেন বটে, কিন্তু এখানে স্পষ্ট টের পাওয়া যায় 'জীবনস্মৃতি'র প্রতিধ্বনি : 'এই সমস্ত বাধা বিরোধ

pathagar.net

বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন…।' জীবনস্মৃতি, ১৯৬২, পৃ ১৫২।

২৫ জীবনস্মৃতি, ১৯৬২, পৃ ১৩২।

২৬ William Blake (1757-1827)-এর হাতে-লেখা এই মন্তব্যটি পাওয়া গিয়েছিল Lavater-এর *Aphorisms on Man* বইটির মধ্যে। সম্পূর্ণ কথাটি এই রকম : 'For let it be remember'd that creation is God descending according to the weakness of man, for our lord is the word of God and *everything on earth is word of God* and in its essence is God.' *Blake : Complete Writings*, ed. Geoffrey Keynes, London, 1966, p. 87.

২৭ ভিক্টোরিয়া এখানে ইয়েট্সের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন নি, কথাগুলিকে সাজিয়েছেন খানিকটা তাঁর নিজের ভঙ্গিতে। ইয়েট্সের মূল বক্তব্য ছিল এইরকম : 'That portion of creation, however, which we can touch and see with our bodily senses is "infected" with the power of Satan, one of whose names is "Opacity" ; whereas that other portion which we can touch and see with the spiritual senses, and which we call "imagination" is truly "the body of God", and the only reality.' *Poems of William Blake*, ed. W. B. Yeats, London, 1969, p. xxxii.

২৮ ভিক্টোরিয়ার এই মন্তব্যও একেবারে ইয়েট্সের প্রতিধ্বনি। ইয়েট্স লিখেছিলেন : 'Blake held all "natural events" to be but symbolic messages from the unknown powers.' *Ibid*, p. xxxix.

স্বাভাবিক ঘটনা থেকে কী ভাবে ব্লেক দৈব ইঙ্গিত পেতেন, তার উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন ইয়েট্স। Schofield নামে এক

pathagar.net

সৈনিকের সঙ্গে আকস্মিক সংঘর্ষের পরিণতিতে ব্লেককে আদালত পর্যন্ত পৌঁছতে হয়। অভিযোগ থেকে মুক্তি পান ব্লেক, কিন্তু পুরো এই ঘটনাটিকে তাঁর বিশেষ তাৎপর্যময় বলে মনে হলো, পরে তাঁর *Jerusalem* (1804-20) কাব্যের অন্তর্গত হলো ওই চরিত্র, অ্যাডাম হিসেবে : 'Schofield is Adam who was New-created in Edom.' (*Jerusalem*, Chapter 1).

২৯ ব্লেকের *The Marriage of Heaven and Hell* (1790-93) থেকে গৃহীত এই অংশ : 'If the doors of perception were cleansed every thing would appear to man as it is, infinite.' *Blake : Complete Writings*, ed. Geoffrey Keynes, London, 1966, p. 154.

৩০ সাঁ-জন্ পার্সের এই কথাটি এর আগেও একবার ব্যবহৃত। এ-অধ্যায়ের ১১-সংখ্যক সূত্রটি দ্রষ্টব্য।

pathagar.net